ভাবনগর
BHABNAGAR

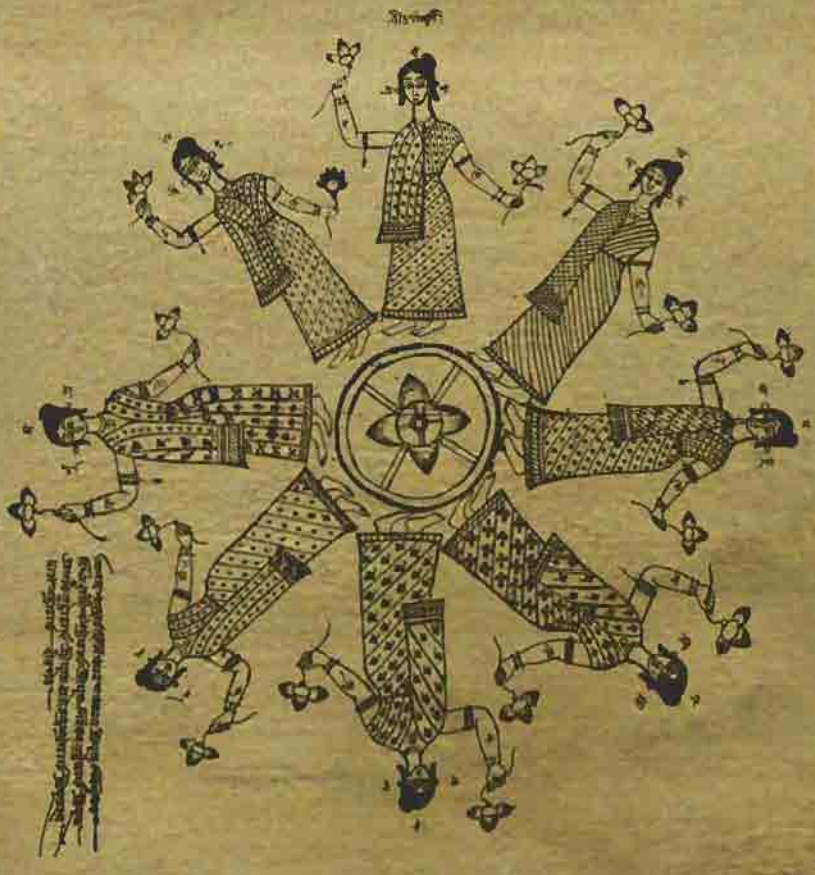

International Journal of Bengal Studies

VOLUME 1 · NUMBER 1 · AUGUST 2014

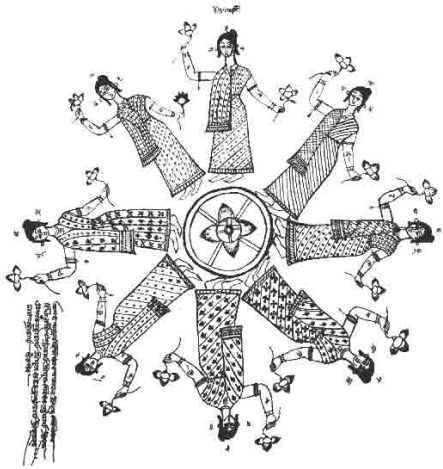

Bhabnagar, the international journal of Bengal Studies, is a peer-reviewed journal published three times of a year by the Bhabnagar Foundation. The journal publishes original articles in the field of Bengal or Bangla Studies, as broadly defined. The views expressed are the authors, not necessarily those of the Foundation or its officials. Articles and communications should be sent to the editor. Books and audio recordings for review and citations for current publications should also be sent to the appropriate editor or bibliographer.

The vision of *Bhabnagar* is to create a long-term coordination between research initiatives in the field of Bengal Studies in the international arena. Scholars in many countries in Europe, America and Asia have for decades worked on Bengal Studies focusing on the rich and widely popular cultural traditions in the Bangla language. But now a need is felt to incorporate these disconnected ventures into a mainstream confluence of international Bengal Studies.

This publication will articulate the achievements, characteristics and historical chronology of Bengal Studies, which will hopefully prove stimulating to the researchers of subsequent generations and provide them with effective directions for future research. This process will also re-invigorate interpersonal relationships between faculty in universities across Europe, North and South America, and Asia where Bangla, Sanskrit, Arabic, Persian, Urdu and Hindi languages are research disciplines as a subset of Asian languages and literature. The potential for greater inter-connectedness greatly encourages us as we shape *Bhabnagar* into an effective international tool for Bengal Studies.

Bhabnagar Foundation

Bhabnagar Foundation is a cultural organization, registered with the government of Bangladesh, dedicating to promote research in Bangla literature and culture both locally and globally. The Foundation in December 2013 organized a symposium on ethnomusicology and performance studies at EMK Center, American Embassy, Dhaka, which attracted wide participation by scholars from Bangladesh and the United States. Some of the key initiatives were: 1. Workshop on the Implementation of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and field work across villages in the district of Manikganj on 19 July 2013; 2. Musical dance performance of "Bishad-Jaari", based on classic Bengali novel *Bishad-Sindhu* at the Hay Festival of Literature & the Arts Ltd in Dhaka on 14 November 2013; 3. Arrange a special exhibition with the associate organization VIAAN on the theme of " The dream's Wear: Influenced by folk painting and song" at La Galerie, Alliance Française, Dhaka, on May 2013; 4. *Sadhu Paribarer Gaan* (The Songs of Sadhu Family) songs of devotees arranged with two Sadhu families using traditional musical instruments without electronic sound systems. Sadhu family's singers presented original Baul songs in the event on 30 September 2011.

In the near future Bhabnagar Foundation intends to publish translations, research works and other relevant creative works. The posthumous publication of Carol Salomon's annotated translations of over a hundred Lalan Songs is currently in process. Moreover, Ektara, a sister concern of Bhabnagar Foundation, is going to publish *Nurnama* and an 18th century Bangla commentary on Rupa Gosvamin's *Mukundamuktavali,* both edited by Thibaut d'Hubert (University of Chicago). The Foundation is additionally committed to regularly publishing an international research journal named Bhabnagar. The Foundation also intends to organize international seminars and symposiums in the United States, Europe and different countries of Asia for international knowledge networking on Bengal Studies.

ভাবনগর

B H A B N A G A R

International Journal of Bengal Studies
VOLUME 1 • NUMBER 1 • AUGUST 2014

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী	**Editorial advisory board**
এমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান	Emeritus Professor Anisuzzaman
অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ	Professor Hayat Mamud
অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	Professor Syed Manzoorul Islam
অধ্যাপক মোহীত উল আলম	Professor Mohit Ul Alam
স্থপতি রফিক আজম	Architect Rafiq Azam
লেখক-অনুবাদক মাসরুর আরেফিন	Writer-Translator Mashrur Arefin
সহকারী সম্পাদক	**Assistant Editor**
নাজমীন মর্তুজা	Nazmin Mortuza
প্রচ্ছদ লিপি	**Cover Lettering**
কাইয়ুম চৌধুরী	Qayyum Chowdhury
প্রচ্ছদ সৃজন	**Cover Design**
গুপু ত্রিবেদী	Gupu Trivedi
সম্পাদক	**Editor**
সাইমন জাকারিয়া	Saymon Zakaria

Bhabnagar Foundation
Chekuthi, Concord Emporium, 45 Basement
253-254, Elephant Road, Katabon, Dhaka-1000, Bangladesh.

প্রচ্ছদ চিত্রের পরিচিতি

প্রথম ও শেষ প্রচ্ছদে ব্যবহৃত চিত্রকলা কুমিল্লার রামমালা গ্রন্থাগারের হস্তলিখিত পুথি বিভাগের রক্ষিত *বিচিত্র বন্ধ কবিতা চিত্র* থেকে গৃহীত।
পাণ্ডুলিপি পরিচিতি : ১৯২ নং কাব্য। বন্ধকবিতা: (পদ্মবন্ধ-মায়ারিকাবন্ধ-আবক্ষাদি কবিতা। বি-৬৭। ক্র ১০৪)।

পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ, প্রথমা, জনান্তিক, বিদিত, তক্ষশীলা, ঘাসফুলনদী, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
মধ্যমা, সংহতি, চেকুঠি, প্রকৃতি, কনকর্ড এম্পিরিয়াম, কাটাবন, ঢাকা
আলীগড় লাইব্রেরি, বুক মার্ট, নিউ মার্কেট, ঢাকা
বাতিঘর, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম
বইমেলা, নবাব সিরাজউদৌলা রোড, কুষ্টিয়া
প্রাচ্যসংঘ, সার্কিট হাউস পাড়া, যশোর
টাউন স্টোর, স্টেশন রোড, রংপুর
বইপত্র, জিন্দাবাজার, সিলেট
পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

International Correspondents

Iqbal Karim Hasnu, 248 Fairglen Avenue, Scarborough, Ontario, MIW 1B1, CANADA
Naveeda Khan, Anthorpology Department, Johans Hopkins University, Baltmore, USA
Rehanna Kheshgi, 34 Parkview Road, Glenview, Chicago, IL 60025, USA
Durdana Ghias, 6/124 Saywell Road, Macquarie Fields, New South Wales 2564, AUSTRALIA
Izfandior Arión, Max-Planck-Ring 7, House A, 01-01-10-0, 98693 Ilmenau, GERMANY
Priyanka Basu, B452 Paul Robeson House, 1 Penton Rise, London WC1X 9EH, UK
Zhang Xing, Departmento of South Studies, Peking University, Beijing 100871, CHINA
Jindra Štolcová, Radek Chlup, Rymarovska 434, Praha 19-Letnany, 19900, CZECH REPUBLIC

Printing & Publication Informations

Printed by Laser Scan Limited, 15/2 Topkhana Road, BMA Bhaban, Dhaka-1000, Bangladesh. E-mail : laserscanbd@yahoo.com

Published by Ektara, a sister concern of Bhabnagar Foundation, Chekuthi, Concord Emporium, 45 Basement, 253-254, Elephant Road, Katabon, Dhaka-1205, Bangladesh.
E-mail : saymonzakaria@gmail.com, vabnagarfoundation@gmail.com
Website: www.vabnagarfoundation.com

Price : 150.00 (BDT), 5.00 (USD)

CONTENTS

About The Journal

সম্পাদকীয় / From the Editor

প্রবন্ধ / Articles

দুই বাংলা, না দুই বাঙালি	ক্লিন্টন বি. সীলি	১
বাউল গানের সুর বিচার	শক্তিনাথ ঝা	৩৫
ভাঙিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস : কবি আলাওলের অনুবাদ-পদ্ধতি	থিবো দুবের	৫৭
পাণিনির জাদু : বাংলা কারক সম্পর্কে পর্যালোচনা	হানা-রুথ ঠম্পসন	৭৫
রবীন্দ্রসাহিত্য ও চীন	দং ইউ চেন	১০১

অনুবাদ / Translations

আগে জান না রে মন : ইংরেজি অনুবাদে লালনের গান	কিথ ই. কাস্ত	১১৫

গ্রন্থালোচনা / Book Review

আধুনিকযুগের ধর্ম ও একজন সাধকের দর্শন জাপানি ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থালোচনা	নাজমীন মর্তুজা	১৩৭

গবেষকের চিঠি / Letters from Researchers

খোদাবক্‌শ শাহকে লেখা ক্যারল সলোমনের চিঠি	১৪৭
খোদাবক্‌শ শাহকে লেখা মাসাইয়ুকি ওনিশি-র চিঠি	১৫৩
মন্টু শাহকে লেখা ক্যারল সলোমনের চিঠি	১৫৬
বিজয় সরকারকে লেখা ক্যারল সলোমনের চিঠি	১৬৬

Notes on Contributors	১৬১
Instructions for Contributors	১৬৫
Planning of Bhabnagar	১৬৮

ABOUT THE JOURNAL

Bhabnagar is basically the international mouthpiece of Bengal Studies. This journal will publish academic research articles on various topics of Bangla language, literature and culture. This will be a biannual publication mainly consisting of research articles, book reviews, interviews, letters, translations, movie and documentary reviews. Ideally, the write-ups will be published in Bangla. However, if required, space for the articles in English will be given due importance, along with Bangla translations. Every Bangla article will include an abstract in English and every English article will have an abstract in Bangla. This will be followed in case of reviews of research books on Bangla language, culture and literature.

Before the publication of the second issue of this journal, an international editorial board will be formed consisting of academics and researchers of Bengal Studies and related fields around the world. All of the articles sent are to be evaluated by two of the members of the editorial panel, and the writer will be consulted for any further editing and adjustments if necessary.

Bhabnagar will uphold the diversity of Bangla language, culture and literature to the global community, shedding light on its multi-dimensional relationship with Sanskrit, Arabic and Farsi.

সম্পাদকীয় ॥ From the Editor

বেঙ্গল স্টাডিজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গৃহীত ও সমাদৃত বিদ্যাচর্চা। ভৌগলিক অবস্থানে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎবঙ্গের বিস্তৃত এলাকার জ্ঞান-সাধনার ইতিহাস এই বিদ্যার প্রধান আশ্রয়। প্রায় দুই সহস্র বছর ধরে বঙ্গীয় ভূখণ্ডে উদ্ভূত ও চর্চিত বিচিত্র ধরনের ভাষারীতি, ভাব-সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পকলা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি বেঙ্গল স্টাডিজের অধীত বিষয়। আমাদের জানামতে, দুই শতাব্দীর অধিককাল ধরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বহু পণ্ডিত-গবেষক, অধ্যাপক-শিক্ষার্থী বিচিত্র উপায়ে ও বিচিত্র বিষয়ে বেঙ্গল স্টাডিজ নামের বঙ্গীয় জ্ঞান-বিদ্যাচর্চার গবেষণায় নিয়োজিত, যার ধারাবাহিকতা প্রবহমান।

বঙ্গীয় বিদ্যাচর্চার অতীত ও বর্তমান গবেষণা-উদ্যোগকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়নের লক্ষ্যে বাংলাভাষায় আন্তর্জাতিকমানের একটি গবেষণা পত্রিকা হিসেবে *ভাবনগর*-এর এই প্রকাশনা। এর অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো—পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে বেঙ্গল স্টাডিজ-কে অন্তর্ভুক্তিকরণে উৎসাহিত এবং ইউরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থী-গবেষককে বেঙ্গল স্টাডিজের আবিষ্কৃত-অনাবিষ্কৃত এবং বৈচিত্র্যময় ভাবাদর্শের প্রতি গবেষণায় আকৃষ্ট করা।

ভাবনগর পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে বেঙ্গল স্টাডিজের বিচিত্র বিষয় নিয়ে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গবেষকের লেখা ৫টি মৌলিক প্রবন্ধ, অনুবাদকের ভূমিকা-নিবন্ধসহ লালন সাঁইজির ৮টি গানের ইংরেজি অনুবাদ, জাপানি ভাষায় প্রকাশিত বাংলার ভাব-সাধনা সম্পর্কিত ১টি গ্রন্থের আলোচনা এবং আমেরিকা ও জাপানের দুইজন গবেষকের হাতে-লেখা ৭টি চিঠি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমেরিকান অধ্যাপক ক্লিন্টন বি. সীলি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ব্যবহৃত বাংলাভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যদিও ভারতের একজন কথাসাহিত্যিকের একটি উপন্যাস এবং বাংলাদেশের একজন নাট্যকারের ৮টি নাটকের আখ্যানের বিষয়বস্তু, রচনা-কৌশল, ভাষারীতি ইত্যাদি বিশ্লেষিত হয়েছে; পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষার লেখকদের রচিত সাহিত্যের তুলনামূলক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং বিশ্বজুড়ে প্রচলিত একই ইংরেজি ভাষার বহু রূপ নিয়েও কিছু চমকপ্রদ তথ্য-বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

ভারতের অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা বাউল গানের সুরবিচারে বাংলার ভাব-সাধন পদ্ধতির সাথে দেশ-কাল-পাত্র, আঞ্চলিকতা এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটিতে মৌলিক গবেষণার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

জার্মানের অধ্যাপক হানা-রুথ ঠম্পসন তুলনামূলক-পদ্ধতিতে বাংলা ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত 'কারক' সম্পর্কে প্রচলিত ও জনপ্রিয় ধারণাসমূহের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। প্রবন্ধে সংস্কৃত বৈয়াকরণিক পাণিনি প্রবর্তিত ধারণার সাথে বিশ্বের অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণের তুলনামূলক ও প্রাণবন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে; বাংলা ব্যাকরণের ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য এটি পথিকৃতের ভূমিকা রাখবে।

ফরাসি অধ্যাপক থিবো দুবের বাংলাভাষার মধ্যযুগের অন্যতম কবি আলাওলের সাহিত্যকীর্তির সৃজনশীল অনুবাদ-রূপান্তরের পদ্ধতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটিতে হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষায় রচিত সাহিত্যাদর্শে রচিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবির মৌলিকত্ব প্রমাণিত হয়েছে; এছাড়া, সাহিত্য রচনায় বাঙালি কবির নিজস্ব নন্দনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়েছে।

চীনা অধ্যাপক দং ইউ চেন তুলনামূলক-সাহিত্য বিচারের চীনের সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাবের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধে বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চীন ভ্রমণ এবং তা যুগপৎ রবীন্দ্রনাথের চেতনালোক ও চীনের তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের সৃজনশীলতাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে—সে বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

ম্যাক্সিকান-আমেরিকান গবেষক কিথ ই. কান্ত তুলনামূলক-ধর্মতত্ত্বের বিচারে আমেরিকান সাধক-সম্প্রদায়ের ভাবসাধনার ধারার সাথে বাংলাদেশের ভাবসাধক লালন সাঁইজির ভাব-সাধনার সাদৃশ্য বিচারপূর্বক ৮টি গানের মূল বাংলাপাঠসহ ইংরেজিতে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থালোচনায় বাংলাদেশের গবেষক-কবি নাজমীন মর্তুজা জাপানি ভাষায় রচিত অধ্যাপক মাসাহিকো তোগাওয়া-র লালন সাঁইজির জীবন-দর্শন বিষয়ক একটি গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেছেন। আলোচনায় একজন বিদেশি গবেষকের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষকের চিঠিপত্র হিসেবে বাংলাদেশের ভাবসাধকদের উদ্দেশ্যে লেখা আমেরিকার প্রয়াত গবেষক ক্যারল সলোমন এবং জাপানের গবেষক মাসাইয়ুকি ওনিশি-র প্রেরিত ৭টি চিঠি সংকলিত হয়েছে। চিঠিগুলির ভেতর দিয়ে বিদেশি গবেষকদের বেঙ্গল স্টাডিজের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের তৎপরতার কথা যেমন জানা যায়, তেমনি বেঙ্গল স্টাডিজের প্রতি বাংলার বাইরের গবেষকদের সুগভীর নিবেদনের কথাও উপলব্ধি করা যায়।

ভাবনগর এভাবেই বেঙ্গল স্টাডিজের আন্তর্জাতিক গবেষণার বিভিন্ন ধারা-উপধারা বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থালোচনা, সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রকাশনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রত্যয়ী।

সবার মঙ্গল হোক।

খণ্ড ১, সংখ্যা ১
Vol. 1, No. 1

ভাবনগর
BHABNAGAR

আগস্ট ২০১৪
August 2014

দুই বাংলা, না দুই বাঙালি

ক্লিন্টন বি. সীলি

দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে ২০১২-এ অনুষ্ঠিত দুই বাংলা নামে তৃতীয় সাউথ এশিয়ান লিটারেচার কনফারেন্স-এর পোস্টার

Dui Bangla, na dui Bangali

Clinton B. Seely

Abstract

In this article the roots of the Bangla language in two regions, both the independent country of Bangladesh and the state of West Bengal in India, are analyzed from a literary perspective by two authors. The first author, Raghab Bandyopadhyay, is a linguist and novelist based in Kolkata and the other author, Saymon Zakaria, is a playwright in Bangladesh. Before discussing these two literary languages as a single pair, however, they note the many forms that can be taken by a single language, citing different characteristics that distinguish the fields of American English literature, British English literature, African English literature, and Australian and South Asian English literature. They then recount various literary opinions on this subject from around the world. Finally, the article deals with literary creations by two Bengals at their border which indicate a single Bangla literature; an elaborate analysis with quotations is presented on the modes of speech, story-weaving, election narratives, and more on this subject as found in two countries, two birthplaces, and by two authors. Using one and the same Bangla, various authors of literature—just as with authors of literature and their literary works in different countries around the world—have created a comparative literature that is discussed by two contemporary authors.

দক্ষিণ এশিয়ান সাহিত্যের উপর এই তৃতীয় নরম্যান কাটলার কনফারেন্স-এর দুই শব্দের শিরোনাম "দুই বাংলা" এবং এর বর্ণনাত্মক উপশিরোনাম: "পশ্চিম বাংলার রাজ্যভাষা এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"। কনফারেন্সের উপজীব্যকে আরো সবিস্তার করা হয়েছে এরকম উদ্দেশ্য নির্ণয় করে: "বাইসেফ্যালাস সাহিত্যের স্বরূপ: এমন দুই মুখ যারা কখনো পরস্পরের সাথে কথোপকথন থামায় না"। আমি আমার বক্তব্যের নাম দিয়েছি "দুই বাংলা, না দুই বাঙালি?" যার শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। আমি আমার শিরোনামের অর্ধেক অনুবাদ করে বলবো এবং তারপর অ-অনূদিত অর্ধেকে ফিরব। অনুবাদ বলতে আমি বোঝাচ্ছি "দুই বাংলা বা Two Bengalis?" এই মুহূর্তে "দুই বাংলা" অ-অনূদিত হিসেবে ব্যবহার করবো, কারণ, এই কনফারেন্সে উপস্থিত সকলেই আমরা বেশ জানি যে 'বাংলা' শব্দটির দুটো মানে হয়—এক. একটি ভাষা, দুই. একটি ভূখণ্ড। যেকোনো শ্লেষ বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দের মতোই এখানে দুটো মানেই জীবন্ত ও (শব্দটা শুনলে) দুটোই কানে স্পর্শ করে, উৎপত্তিকালে শব্দটার যে মানেই থাকুক না কেন। "দুই বাংলা"র মানে Two Bengals (ভূখণ্ডভিত্তিক দুটো আলাদা জায়গা) এ কথাটি অবশ্য সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আপনি যদি গোপনে একজন তেমন কোনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজনীতিবিদ না হয়ে থাকেন, যিনি দুই বাংলাকে পুনরেকত্রিত করে অবিভক্ত বাংলায় রূপান্তরিত করতে চান এবং আমি নিশ্চিত যে তেমন বিদ্রোহী এখানে কেউ নাই। Terra firma-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিঃসন্দেহেই এই হচ্ছে "দুই বাংলা"র মানে। এই দুই দিনের কনফারেন্সে, তবে, "দুই বাংলা"র অন্য মানে। অর্থাৎ, যাকে বাংলা বলি সত্যি সত্যিই দুই ভাষা, এক নয় কি? অন্তত আমাদের সবার কাছে প্রশ্ন হিসেবে এ কথাটি উত্থাপন করা হোক, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তা গৃহীত হবে না। যদি আমার মন্তব্যকে সিরিয়াসলি নেওয়া হয়, অর্থাৎ, আমার কীনোট পেপারের বিষয়কে যদি কনফারেন্সের প্রধান ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আমি সবাইকে একটি প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে বলবো—আসলেই কি দুই বাংলা আছে, দুটো বাংলা ভাষা? এবং

কীভাবে এই দুই ভাষাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে? এর সাথে আরো একটি সম্পূরক প্রশ্নঃ কোন্ বিবেচনায় এই দুই ভাষার দুই সাহিত্যকে, যদি আদৌ তা দুই সাহিত্য হয়, ভিন্ন ভিন্ন বাংলা সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হবে?

এই ধরনের কনফারেন্সে কী বিষয়ে বলা যায়—তা নিয়ে আমি যখন ভাবতে শুরু করেছিলাম, আমি তখন কিছু তুলনামূলক পরিস্থিতির সন্ধান করছিলাম, যার উপর ভিত্তি করে একটি ভাষাকে দুটি ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম—এরকম প্রশ্নের কোনো জুতসই উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম নই জেনেও—কীভাবে আমেরিকার ইংরেজি ইংরেজদের ইংরেজির থেকে আলাদা, কিংবা সাউথ আফ্রিকান ইংরেজির থেকে, অথবা অস্ট্রেলিয়ান বা দক্ষিণ এশিয়ার ইংরেজি থেকে। এই প্রশ্নকে স্বাভাবিকভাবেই অনুসরণ করল আরো প্রশ্ন—অবশ্যই আমি এসবের উত্তর দিতে পারবো না—কীভাবে আমেরিকার ইংরেজি সাহিত্য ব্রিটিশ ইংরেজি সাহিত্য, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজি সাহিত্য, এবং অস্ট্রেলিয়ার এবং দক্ষিণ এশিয়ার ইংরেজি সাহিত্য থেকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা।

আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, একটা মনোরম সুবচন, ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপলব্ধি করা হয়—এটা মনে এলো আমেরিকান ও ব্রিটিশ ইংরেজির মধ্যে মিলের অভাব সম্বন্ধে। অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর রচনায় এক আমেরিকান নারী চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেনঃ "সে (নারী চরিত্র) ছিল পুরোপুরি ইংরেজ, এবং তাকে উদাহরণ হিসেবে দেখলে বোঝা যায় যে, আজকাল আমেরিকার প্রত্যেক বিষয়ের সাথেই আমাদের মিল আছে, কেবল একটি বিষয় ছাড়া, এবং তা অবশ্যই ভাষা"।

অস্কার ওয়াইল্ড

এই মজার কথার তীক্ষ্নতর রূপ বার্নার্ড শ এবং উইনস্টোন চার্চিলেও কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে, তা হলোঃ "ব্রিটেন এবং আমেরিকা একই ভাষা দ্বারা বিভক্ত দুটো আলাদা জাতি"।

বার্নার্ড শ

উইনস্টোন চার্চিল

বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলাও কি একই ভাষা দ্বারা বিভক্ত আলাদা দুটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব? যদি তা সত্যি হয়, কোন্ দিক থেকে এই বিবৃতি অর্থপূর্ণ?

এখন আমি ভাষা থেকে সরে গিয়ে সাহিত্যের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ধরা যাক, আমেরিকান সাহিত্য এবং অন্যান্য দেশের ইংরেজি ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হয়, যদি আমি জোরের সাথে তা বলতে পারতাম, তাহলে শুরুতেই আমাকে আমেরিকান সাহিত্যের এক প্রকার বর্ণনামূলক সংজ্ঞা দিয়ে নিতে হতো। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটা পারতাম না, এবং এরকম চেষ্টা করাটা আমার জন্য বোকামি হতো। এখন যদি আমরা বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকাই, আমরা নিশ্চিত করেই জানি যে, কখনো কখনো এক বাংলা সাহিত্যকে নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে আরেক বাংলা সাহিত্যের সাথে তুলনা করে।

পূর্ব পাকিস্তান আমলের এরকম একটি নমুনা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। আমি এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ভারতীয় বাঙালি লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। শংকরের (মণি শংকর মুখার্জি) *এপার বাংলা, ওপার বাংলা* নামক ভ্রমণকাহিনীর আদলে লেখা বইয়ের (এই বইয়ে ভারত ও পাকিস্তানি বাঙালিদের শান্তিপূর্ণভাবে ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে আমেরিকায় প্রবাস জীবনযাপন করার সক্ষমতার প্রতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ উপস্থাপিত হয়েছে, এবং এটা ১৯৬৭ সালের শেষ দিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় লেখকের দুই মাস যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের উপর ভিত্তি করে লেখা) সম্পাদকীয় ভূমিকায় তারাশঙ্করকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বইটি কলকাতায় ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর লাইব্রেরির সংগ্রহে বইটি আছে। অতিরিক্ত

হিসেবে লাইব্রেরি থেকে পরিত্যাক্ত হওয়ার পর এর একটি পূর্ব পাকিস্তান সংস্করণ এখন আমার মালিকানাধীন, বইটিতে প্রকাশের দিন-তারিখ উল্লেখ নেই, তবে অবশ্যই একই বছরে বা ১৯৭১ এর শুরুর দিকে প্রকাশিত হয়ে থাকবে, কেননা, আমরা জানি যে ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম দিক থেকে সেখানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং সে বছরের শেষে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আর অস্তিত্বশীল ছিল না, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানি এই সম্পাদক শংকরের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় গর্বিতভাবে—আমি বরং বলতে চাই উল্লসিতভাবে—পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের সাথে পশ্চিম বাংলার বাংলা সাহিত্যের তুলনা করে লেখা তারাশঙ্করের মূল্যায়নধর্মী রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

"পূর্ব বাংলার সাহিত্য যেটুকু পড়বার সুযোগ পাই তাতে দেখি একটি জীবনময় আদর্শের ছবি—পূর্ব বাংলার জনজীবনের ছবি, আর আমাদের এখানে এত সাহিত্য হচ্ছে কিন্তু অন্ধকার যেন গাঢ় হয়ে আসছে; আত্মবিশ্বাসের অভাব, আদর্শের অভাব। ওদের ছবি সতেজ, সবুজ ও আত্মবিশ্বাসের চিন্তায় নিমগ্ন, আমাদের সাহিত্যে এসেছে অবসাদ, ক্লান্তি, ফ্রাসট্রেশন। আমাদের লেখকরা বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসার অজুহাতে কোন্ পথে পা বাড়িয়েছেন তার বিচার করবেন বিদগ্ধজন, কিন্তু আমরা সাধারণ পাঠকরা যে অনেক ক্ষেত্রেই হতাশ হচ্ছি, এ আক্ষেপ আর চাপা নাই।" (পৃ: 'ক')

আমি বলতে চাই, পূর্ব পাকিস্তানি সম্পাদক তারাশঙ্করের সেই উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পুলক বোধ করেছেন, যেখানে পশ্চিম বাংলার বিষণ্ন বাংলা সাহিত্যের

শংকর (মণি শংকর মুখার্জি)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ তিনি এটা তুলে ধরতে উদগ্রীব যে সত্যিকার বাংলা সাহিত্যের জমিন হচ্ছে—পূর্ব পাকিস্তান। *এপার বাংলা, ওপার বাংলা*-য় শংকর সততার সাথে আমেরিকায় তাঁর সাথে একজন পাকিস্তানি বাঙালির কথোপকথন তাঁর পাঠকদের জন্য হুবহু লিখেছেন। শংকর নিজে উদ্ধৃত করেছেন: "খাঁটি বাংলা সাহিত্য (সংস্কৃতি) বলতে যা বোঝায় তা একদিন হয়তো কেবল পূর্ব-পাকিস্তানেই বেঁচে থাকবে।" (পৃ: ১৪)

আমার অনুমান চার দশক আগের করা শংকরের এই মন্তব্য সত্যিকারের মূল্যায়নের থেকে বরং চটকদারিত্বের খাতিরেই কৃত। যেমনটা আমি বলেছি, একটা সমগ্র সাহিত্য নিয়ে সাধারণ মন্তব্য করার যোগ্য আমি নই—এমনকি দুই সাহিত্য নিয়ে মন্তব্য করার যোগ্যতা আমার আরো কম, যেমনটা কিনা তারাশঙ্কর করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু, নিজের পুনরাবৃত্তি করেই বলছি, এই কনফারেন্সের শিরোনাম থেকে আমার ভেতরে জেগে ওঠা প্রশ্নটার উপর জোর দিচ্ছি। আমি আমাদের সবার এটা উপলব্ধি করার উপর জোর দিচ্ছি যে, বাংলা দুটো সাহিত্য ধারণ করে না। বরং, বাংলা একটিই সাহিত্য—যার চর্চা করে দুই সাহিত্যিক, অর্থাৎ একই সাহিত্যের দুই রচয়িতা—আজকে আমাদের মধ্যে তারা উপস্থিত। পুনরায়

দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত দুই বাংলা শীর্ষক কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী ফিলপ বেনুয়া, রাজিমা চৌধুরী, হানা-রুথ থম্পসন, সাইমন জাকারিয়া, মন্দিরা ভাদুড়ী, থিবো দুবের, রিহান্না খেসগি, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের মাঝে গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দিচ্ছেন ক্লিন্টন বি. সীলি

আমি আমার সূচনা বক্তব্যের, "দুই বাংলা, না দুই বাঙালি?" শিরোনামে ফিরে এলে যে উত্তর আমি খুঁজছি, তা হলো অবশ্যই—"দুই বাঙালি, দুই বাংলা নয়"।

বাকি সময়টা ধরে আমি সাহিত্যকর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাই- এক বাংলার সাহিত্য নিয়ে—যা দুই বাঙালি লেখকদের সৃষ্টি। প্রারম্ভেই আমি সীমিত সংখ্যক উৎসের কথা উল্লেখ করতে চাই যার উপর ভিত্তি করে আমার মন্তব্য রচনা করবো। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁকে দিয়েই শুরু করতে চাই। কারণ, দুই লেখকের মধ্যে তিনি বয়সে বড়। আমি তাঁর ২০০৮ সালে প্রকাশিত চারশ' পৃষ্ঠার উপন্যাস *সটীক জাদুনগর*-এর এক চতুর্থাংশ পড়েছি, নামটির ইংরেজি অনুবাদ আছে, The Magic City... with Footnotes নামে। অধিকন্তু আমি আমাদের দীপেশ চক্রবর্তী ও তাঁর মধ্যে একটা কথোপকথন পড়েছি, যেটা অনুষ্টুপ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, যদিও সেখানে *সটীক জাদুনগর*-কে কেন্দ্র করে নয়, কিন্তু সেটা এই উপন্যাস প্রকাশিত হবার পরপরই হয়েছিল এবং বেশ কয়েকবার তখনকার এই সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের প্রসঙ্গ সেখানে এসেছে।

আমি যে কাজের উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করবো, তা যদি খুব অপ্রতুল হয়ে থাকে তবে তা আমার দোষ, অথবা এই বলে আমি নিজেকে কিছুটা রক্ষা করতে পারি যে, এর পিছনে ভৌগলিক কারণ আছে। আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির এই জ্ঞানের স্বর্গের কাছাকাছি আর থাকি না। আবার একেবারে এখান থেকে দেশান্তরিও হইনি। তবে, বিশেষ করে, এইরকম সব উপলক্ষে—আমার

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সটীক জাদুনগর-এর প্রচ্ছদ

সাইমন জাকারিয়ার মৌলিক নাটক সংকলন-এর প্রচ্ছদ

গ্রামীণ নিবাস উইসকনসিনের ডোর কাউন্টি পেনিনসুলা বেথান থেকে আমি আসি এবং আমার স্ত্রী ও আমি নাম দিয়েছি "বনপ্রস্থ", মনে হতে পারে যেন সে নিবাস, হয়তো ঠিক সত্রেটিক নির্বাসন নয়, অন্তত আপেক্ষিক নির্বাসন, যেখানে মনের জন্য কিছুটা সুযোগ-সুবিধার অভাব আছে।

সাহিমন জাকারিয়া প্রসঙ্গে বলি, তাঁর ২০১০ সালে প্রকাশিত আটটি নাটকের সংকলন *নাটকসমগ্র* আমি পড়ার সুযোগ পেয়েছি, অবশ্য নাট্যকারের সাথে দীপেশের মতো কারো সংলাপ আমার পড়া হয় নি। তবে, বেশ সিনিয়র, বিদগ্ধ সাহিত্য-ঐতিহাসিক, সমালোচক আর লেখক অরুণ সেনের লেখা ভূমিকা উপরন্তু নিজেই পড়েছি।

সটীক জাদুনগর-এর কথা প্রথমে বিবেচনা করা যাক। গ্রন্থ-শিরোনামের এই জাদুনগর হলো—কলকাতা। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে *খাঁটি কলকাতা*, কারণ এই শিরোনাম চট করে আমাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যায়, যার বাস্তবতা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। *জাদুনগর*, একটি যৌগিক শব্দ, প্রবলভাবে *জাদুঘর*-এর অনুরণন, এমন একটি শব্দ যার ইংরেজি অনুবাদ প্রায়শ *মিউজিয়াম* হয়। গত কমপক্ষে ২০-২৫ বছর ধরে আমরা জাদুঘরের ধারণা এবং এগুলোর সুনির্দিষ্ট বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করা সম্পর্কে প্রশ্নের কাছে এসেছি।

কলকাতার জাদুঘর হলো—উপনিবেশিক আমলের পুরানো *ক্যালকাটা মিউজিয়াম*। এটাকে দেখা হয়েছে উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে, উদ্দেশ্য নির্ণয়ের, সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যম, এবং অপরকে নিয়ন্ত্রণের।

মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপেশ চক্রবর্তী

জাদুঘরগুলো তাদের নিজস্ব বাস্তবতা তৈরি করে, নিজের মতো করে জ্ঞান উৎপাদন করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে আপাতত এই বিতর্ক উদ্রেককারী বাক্য আমি এখানে থামিয়ে দিলাম।

আমরা এসব সম্পর্কে সবাই আগেই শুনেছি, যার সূচনা হয়েছিল এডওয়ার্ড সাইদের *ওরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮)-এ। আমরা সম্ভবত সবাই আমাদের লেখায় জাদুঘরের উপমা ব্যবহার করেছি। বাংলাদেশের ঢাকার বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সম্মানে রচিত আমার প্রবন্ধ festschrift-এর প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, আশা করি নিজের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি বলে আপনারা কিছু মনে করবেন না: "কিম, রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লিখিত উপন্যাস যার শিরোনাম নায়কের নাম থেকে দেওয়া, শত বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠকদের সহায়তা করেছে ভারতবর্ষকে মিউজিয়ামাইজ করতে (জাদুঘরীয় রূপ দিতে)।"

"মিউজিয়ামাইজিং"—অভারতীয় পাঠকদের সন্তুষ্ট করতে, এবং আপাতভাবে, তাদের কৌতূহলী পাঠচিত্তকে ভারতীয় বহির্দৃষ্টির কিপলিঙীয় চিত্র তুলে ধরাই *সটীক জাদুনগর* উপন্যাসের মূল বিষয় বা উদ্দেশ্য অবিশ্যি নয়, কিন্তু জাদু, দ্যা ম্যাজিক, জাদুঘর সবসময়ই বর্ণনা স্তরের অন্তরালে রয়ে গেছে।

তালতলার কেন্দ্রীয় কলকাতার এলাকা, পারিবারিক পরিবেশ এবং উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের বর্তমান বাড়িকেও এমনকি এক সময়ের জাদুঘর হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে: "তালতলার মতো হেরিটেজ পাড়াগুলোয় মানুষের জীবনযাত্রার

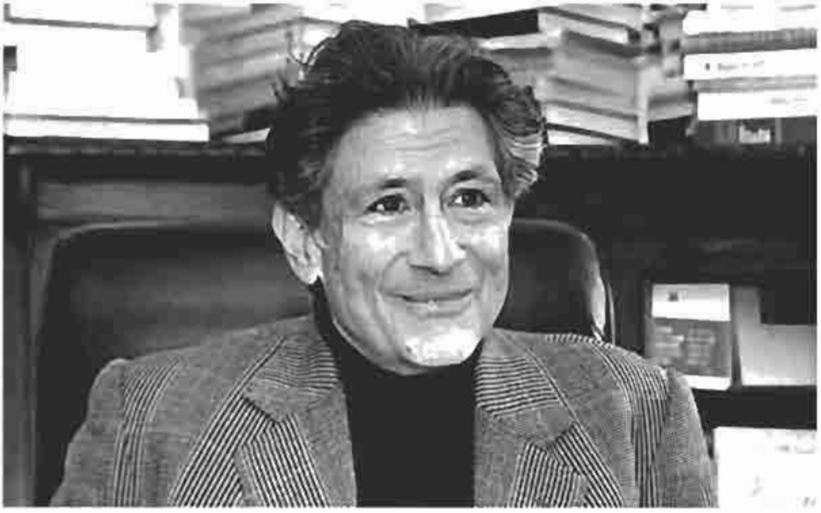

এডওয়ার্ড সাইদ

স্টাইলটা সাবেক থেকে যাওয়ায় এ জাতীয় পাড়াগুলো হয়ে উঠেছে জাদুঘর। সাবেক ইতিহাসের জলজ্যান্ত অধ্যায়।" (পৃ: ১৬১)

২০০৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর দীপেশ ও রাঘবের মধ্যেকার কথোপকথনে দীপেশ এই কথা দিয়ে শুরু করেছেন যে, রাঘব তাঁর সাহিত্যে যা করেছেন এবং *সটীক জাদুনগর*-এ যা করা অব্যাহত রাখলেন, তাকে দীপেশ বলছেন "ডকুমেন্টেশন" (প্রামাণ্য রচনা)। "ডকুমেন্টেশন" শব্দটি বাংলা শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং "ডকুমেন্টেশন" সম্ভবত মিউজিয়ামাইজিং-এর চেয়েও ভালো শব্দ, যদিও ডকুমেন্টেশন এক অর্থে হলো—দলিল-দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করে রচিত বর্ণনামূলক জাদুঘর বিনির্মাণ।

এখন এই উপন্যাসে যাই: *সটীক জাদুনগর* উপন্যাসে, রাস্তার উপরে একটি লাশ পড়ে আছে, আমাদের প্রধান চরিত্র তার ব্যালকনি থেকে তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এই লাশটা কি বাস্তব? কীভাবে এটা বাস্তব হয়? কেউ কেন এটার কোনো গতি করছে না? কার লাশ এটা? এটা, এক অর্থে, এই স্মরণীয় জাদুর শহরের পুরো গল্পের অ্যাঙ্কর। শুরুতেই লাশটা এখানে আছে; শেষেও আছে, যদিও শেষে গিয়ে অন্তত এর পরিচয়টা জানা যাচ্ছে, এরকমটাই আমি জানতে পারলাম লেখক কর্তৃক রচিত এ বইয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায়।

সটীক জাদুনগর উপন্যাসে কথিত কলকাতার এস. এন. ব্যানার্জী রোড

ভার্জিনিয়া উলফ

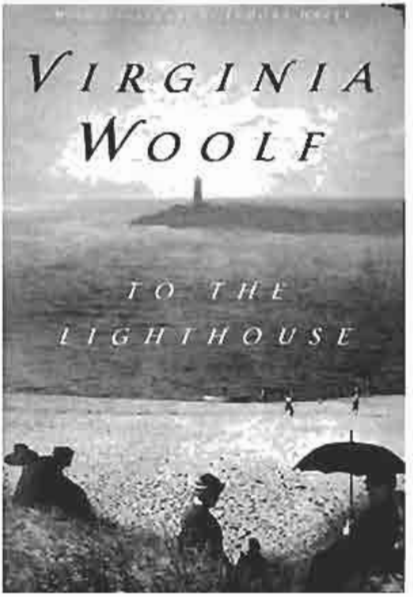

টু দি লাইটহাউজ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

এই বর্ণনামূলক উপাদান ভার্জিনিয়া উলফের উপন্যাসের লাইটহাউসের কথা মনে করিয়ে দেয়। লাইটহাউসটা সবসময়ই আছে, এবং পরিবারটির সদস্যরা, মিসেস র‍্যামসে বেশির ভাগ সময় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, চিরকালের জন্য পরিকল্পনা করছে ওই লাইটহাউসে বেড়াতে যাবার। অধিকন্তু, এই *টু দি লাইটহাউস* বা *লাইটহাউসের দিকে* নামে ট্রিলজি উপন্যাসের প্রথম পর্বকে বলা হয়—"জানালা", এবং আমরা পুরো সময়ব্যাপী সচেতন যে, মিসেস র‍্যামসে উপন্যাসের সিংহভাগ অংশেই সময় কাটান জানালার কাছে বা পাশে গিয়ে জানালার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। পাঠকেরা অন্তত সচেতন থাকে—এই জানালা সম্পর্কে এবং এর ভেতর দিয়ে কী দেখা যায় সে সম্পর্কে; অনেকটা যেন *সটীক জাদুনগর*-এ ব্যালকনি থেকে ঘটনা দেখার মতো কাপড়ে ঢাকা লাশ পড়ে আছে রাস্তায়, যা চতুর্থ তলার ব্যালকনি থেকে দেখা যায়।

লাইটহাউসের দিকে-র পাঠকদের পক্ষে সব সময় সচেতন থাকা কঠিন যে কীভাবে এবং কখন বর্ণনার পরিপ্রেক্ষণ তিন অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে মিসেস র‍্যামসে থেকে অন্য কোনো চরিত্রের দিকে যাচ্ছে, পরবর্তী দুই অধ্যায়ের ঘটনা ঘটছে মিসেস র‍্যামসের মৃত্যুর পর। উলফের বর্ণনা কৌশলের একটা নাম আমাদের জানা আছে। একে বলে "স্ট্রিম অফ কনসাসনেস" (চেতনার স্রোত)।

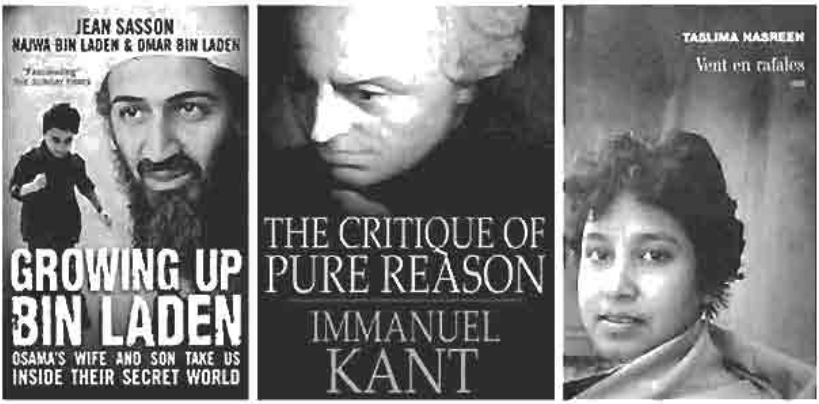

সটীক জাদুনগর উপন্যাসের আলোচনায় বাদ যায়নি লাদেন, কান্ট, তসলিমা নাসরিন

সটীক জাদুনগর-এ আমি একই অনুভূতি লাভ করেছি, কোনোরকম সতর্কতা ছাড়াই পরিপ্রেক্ষণ বদলে যাচ্ছে, সময়কালও অনায়াসে পরিবর্তিত হচ্ছে, এক বা দুই ধাপ এগিয়ে গিয়ে আমরা পাঠকেরা অবশেষে খেয়াল করতে পারি কোথায় চলে এসেছি এবং কার সাথে আছি। আমি *সটীক জাদুনগর*-এর ক্ষেত্রে "স্ট্রিম অফ কনসাসনেস"-এর প্রকাশভঙ্গিকে একটু রূপান্তরিত করে নিচ্ছি এবং এই বর্ণনাভঙ্গিটির নাম দিতে চাচ্ছি "ক্যাসকেড অফ কনসাসনেস" (চেতনার জলপ্রপাত)। কারণ, চিত্রকল্পগুলো, বর্ণনাকারী, এবং রাঘবের বিবরণের কেন্দ্রীয় বিষয় আসে বন্যার মতো, আমাদের চোখের সামনে যেন জলপ্রপাতের মতো ধেয়ে আসে। আমাদের একটা শহর আছে, নিশ্চয়ই, সেখানে এস. এন. ব্যানার্জি রোড, যে রাস্তার নাম কখনো মিছিল সরণি, কখনো কনডম সরণি। মিছিল সরণি, কারণ এই রাস্তায় হরদম মিছিল হয়, রাজনৈতিক মিছল বা অন্য কোনো মিছিল এরই রাস্তা দিয়েই যায়। কনডম সরণি, কারণ এই রাস্তায় ছোট আকারের হরেক রকম ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। তাছাড়া আমাদের সামনে হাজির করা হয় এক মেয়েদের গান-বাজনা বাদ্য-দল চুলবুলি নামে, যেটা ম্যাডোনা, জ্যানেট জ্যাকসন এবং লেডি গাগার সাথে সাথে, অথবা তাদেরকে পেরিয়ে, অতি ভদ্রতা না মেনে, অতি ভদ্রশীলতার গণ্ডির মধ্যে না রেখে, সামান্য এগিয়ে পা ফেলেছে। ক্ষুদে বার্তা বা অন্য কোনো লিখিত বার্তার শর্টকাট ভাষা নিয়ে আমরা ভাবতে থাকি। আমাদের পরিচয় হয়—বার্ড ফ্লু এবং এর পরিণতির সাথে, এবং মুরগিগুলোর বলী এবং এস. এন. ব্যানার্জি রোড দিয়ে একটা বিরাট মুরগির পুতুল হেঁটে যায়, যেমনটা কিনা নতুন বছরে একটা চীনা ড্রাগনের পুতুল নেচে যায়। এরকম তালিকা দীর্ঘতর করা যায়। একটা বিষয় দ্রুত আবির্ভূত হয়েই দ্রুত অদৃশ্য হয়। ওসামা বিন লাদেনকে 'লাদেনের মজুত মানববোমা' বলে অভিবাদন জানানোয়, গরিব মুসলিম পাড়াকে

ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তাসলিমা নাসরীন হয়ে যাচ্ছেন খ্যাতির চরিত্র। এমনকি ইমানুয়েল কান্টের *ক্রিটিক অফ পিওর রিজন* হাজির হয়ে যাচ্ছে আলোচনায়। কিন্তু সবকিছুকে ঘিরে আছে একটা শহর, একটা জাদুঘরের কাছের তালতলার একজনের দৃষ্টিতে বর্ণিত শহর। উলফের উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম *টু দি লাইটহাউস* দেওয়াটা ঠিক আছে, অনেকদিন হলো মিসেস র‍্যামসে গত হয়েছেন কিন্তু র‍্যামসে সাহেব আর তাঁর দুজন ছেলে লাইটহাউস যে দ্বীপে আছে সেটাতে পৌঁছে যান। এক ধরনের এন্টিক্লাইমেটিক কাজ এবং যে কেউ তর্কের খাতিরে বলতে পারে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এন্টিক্লাইমেটিক। আমি দেখতে চাই *সটীক জাদুনগর* কীভাবে লাশের সমস্যাটা সমাধান করে, নাকি করে না।

লাশের চেয়ে, অবশ্যই, এই শহরের চেয়েও, এমনকি *সটীক জাদুনগর* যেন এই শহরের একজন পর্যবেক্ষক সম্বন্ধে অভির্ভূত হয়। আমাদের সবার জীবনেই প্রায় খেলাচ্ছলে করা সেই সিউডোফিলোসফিক্যাল প্রশ্নটা মনে আসে: যদি জঙ্গলের একটা গাছ ধুপ করে পড়ে যায়, আর সেই শব্দ শোনার মতো কেউ না থাকে, তাহলে কি সেখানে ধ্বনির আলোড়ন ওঠে? একইভাবে, যদি এই শহরের একজন পর্যবেক্ষক না থাকে, তাহলে কি শহরটাই থাকে? সত্যি বলতে কি, এই উপন্যাসে এই পর্যবেক্ষকই সব, পরিশেষেও সব। এবং এই পর্যবেক্ষক হলো তার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিসহ শুভময়। যদিও ষাট বছর বয়সী শুভময় যথেষ্ট বৃদ্ধ, সে

দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে অনুষ্ঠিত দুই বাংলা শীর্ষক কনফারেন্সে চায়ের অবসরে বাংলাদেশের নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া ও পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

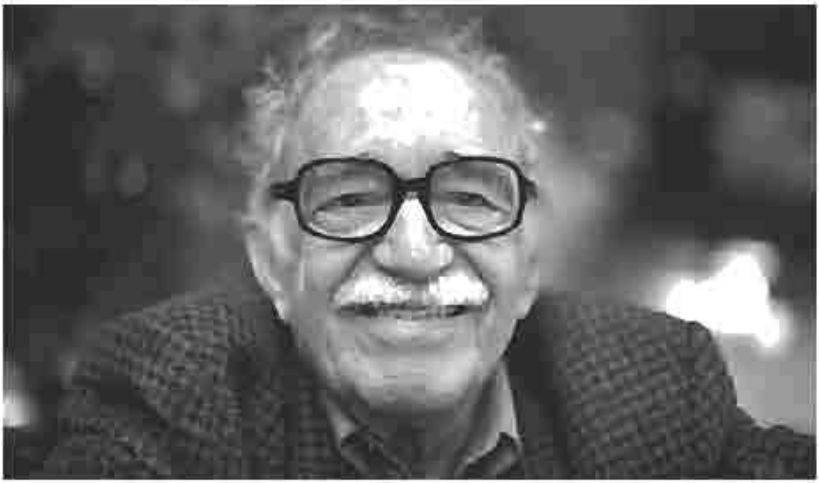

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

হলো তার তিন পুরুষের মধ্যে কনিষ্ঠ; এই তিন পুরুষ বর্ণনার মধ্যেই তাদের উল্লেখ আছে অত্যাধুনিক শব্দবন্ধ 'তিন প্রজন্ম' হিসেবে। 'তিন পুরুষে'র বদলে তন্ময় যখন পূর্বসূরি দুই পুরুষদের স্মরণ করে, তখন তাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। মণিময় হলেন তন্ময়ের ঠাকুরদা এবং স্মৃতিময় ওর বাবা। একজন চতুর্থ জেনারেশনও সংক্ষেপে উপস্থিত, তিনি তন্ময়ের ঠাকুরদার বাবা উমাচরণ, যদিও বিবরণের অংশে তিনি নন, অন্তত আমি যতগুলো পৃষ্ঠা পড়েছি তাতে তাই মনে হয়েছে। আমরা একটা পাঠ পেয়ে যাই বা আমার বলা উচিত—আমরা এখানে একপ্রকার নামাবলির প্রতিধ্বনি পাই, যেমন—আই. অ্যালান সিলির লিখিত *রুতের নামা*, যেখানে কয়েক প্রজন্মের ইতিহাস বুনে চলে, সাত প্রজন্ম, তার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পূর্বপুরুষেরা, *স্টীক জাদুনগরে* যত প্রজন্ম আছে তার থেকেও বেশি, কিন্তু তবু একই রকম সংস্কৃতির আভাস এবং এক সমৃদ্ধ পরিবেশের।

আরেকটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের *ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিটিউড*-এ বহু প্রজন্মের বিস্তার, যার কিছুটা রেখাঙ্কিত কিন্তু মেটাফরিক জাদুবাস্তব চিত্রকল্প এবং এর মাকন্দ নামের এক শহর। কিছুটা জাদু বা সাহিত্য সমালোচনার কারিগরি ভাষায় যাকে বলা হয় *জাদু বাস্তবতা*, এ দুটো উপন্যাসেই পাওয়া যায়—*ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিটিউড* (গ্রেগরি রাবাসা-র ইংরেজি অনুবাদ, ১৯৭০) এবং *রুতের নামা* (১৯৮৮ সালে প্রকাশিত), জাদুনগর কলকাতার সদৃশ এক জাদু।

এখন আমি কয়েক মুহূর্ত ভাষা বিষয়ে মনোযোগ দেবো, বাংলা ভাষা এবং আপাতত *দুই বাংলা*-র ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করবো, সেই ভাষার উপর

আলোকপাত করে, যে ভাষা আমাদের দুজন বাঙালি লেখক ব্যবহার করেন। ভাষার ক্ষেত্রে সেই ভাষাকেই আমরা নির্দেশ করবো, যা আধুনিক মান বাংলা বা চলিত বাংলা। অধিকন্তু, দুই লেখকই প্রকাশ করে এই ভাষার রঙের বিচিত্র পাপড়িগুলো। এই বৈশিষ্টের বৈচিত্র্যটা দেখা যায় নানা রকম বাংলা ভাষার মধ্যে এবং অ-বাংলা ভাষার ব্যবহারেও। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সটীক জাদুনগর* পাঠের সাবলীলতা ও স্বচ্ছন্দ পেতে হলে পাঠককে আধুনিক মান বাংলা যেমন জানতে হবে, তেমনি পুরানো সাধুবাংলাও জানতে হবে, এবং জানতে হবে ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত এবং সমসাময়িক কম্পিউটারে বার্তা লেখার শর্টহ্যান্ড।

অপরদিকে, আমরা যদি সাইমন জাকারিয়ার *নাটকসংগ্রহ*-এর দিকে তাকাই, তাহলে একজনের জানা দরকার, অন্তত মুখের ভাষার লিখিত রূপ পড়তে পারার ক্ষমতা থাকতে হবে, অথবা, এরকম নাটকের প্রদর্শনে যদি উপস্থিত থাকতে হয়, একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষার অর্থ উপলব্ধি করতে পারতে হবে এবং বাংলার দুই রূপ সাধু ও চলিত উভয়ই জানতে হবে, একইসাথে জানতে হবে সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ, বিশেষ করে প্রাচীনকালের বাংলা ভাষা, যে জাতীয় ভাষা চর্যাপদ সাহিত্যে পাওয়া যায়।

আপনারা লক্ষ করুন, আমি বলেছি যে, আমাদের আলোচ্য দুই লেখকের ক্ষেত্রেই পাঠকদের বা শ্রোতাদের ভাষার একটা উচ্চতর রূপ সাধুভাষা জানতে হবে। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কথা বলতে বলতে সাইমন জাকারিয়ার নাটকের কথা বলার সময় আমি এই সাধুকে একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করবো। রাঘবের দুটো চরিত্র আছে যারা সাধুভাষায় কথা বলে, শুভময়ের ঠাকুরদা এবং বাবা।

সাধু বাংলা কখনোই মুখের ভাষা ছিল না, সংলাপের ভাষা ছিল না, এমনকি ১৯ শতকেও যখন ভাষা কেবল একটা রূপ পেতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হলে উদাহরণ হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের গুরুত্বপূর্ণ নাটক ও প্রহসনগুলো দেখা দরকার। সেখানে সংলাপগুলো চলিত বাংলায়, সাধু নয়। যাই হোক, সেই সময় সাহিত্যের বর্ণনামূলক অংশগুলো সাধুভাষাতেই হতো। সাধুভাষা, আমরা জানি, বিশেষ উপলক্ষে প্রদেয় বক্তৃতা বা আনুষ্ঠানিক কথা বলায় শোনা যেতো। দৈনন্দিন কথাবার্তায় সাধু শোনা যেতো না।

সটীক জাদুনগর উপন্যাসে শুভময়ের ঠাকুরদা ও বাবা দুজনে সাধুভাষাতে লিখতেন, যেটা আমরা শুভময়ের ঠাকুরদার কাছ থেকে শুনি, যখন শুভময় তাঁর স্মৃতিতে তাঁর ঠাকুরদার আত্মজীবনী পাঠ করে শোনে। বাবার ক্ষেত্রে, যিনি একজন জল-প্রকৌশলী, যিনি বাংলার নদ-নদী সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন, আমরা শুনতে পাই—তাঁর হয়ে তাঁর একটা বৈজ্ঞানিক পুস্তক আমাদের সামনে

সরাসরি কথা বলছে। যেভাষা রাঘব তাঁদের মুখে দেন সেভাষাটা সাথে সাথে এবং প্রায় অবচেতনভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেয় তাঁর বয়স আর যেযুগে তাঁরা থাকতেন সেযুগ সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা।

এই একই ভাষা, একইরকম কার্যকর ও আকর্ষণীয়ভাবে সাইমন জাকারিয়া তাঁর *নাটকসংগ্রহ*-এর ৮টি নাটকের একটিতে ব্যবহার করেছেন। আমি যে নাটকটির কথা বলছি, সেটা 'বিনোদিনী', যা এই নাটকের একক চরিত্রের নাম এবং একইভাবে যে ব্যক্তিত্বের চরিত্র রূপায়িত হচ্ছে, তাঁরও নাম। সাইমন এমন একটা চরিত্র সৃষ্টি করলেন, যে চরিত্র পুরোপুরি সাধু বাংলার কথা বলে। ভাষার এই রূপ একইসাথে তিনটি স্তরে কাজ করে। প্রথমত, এটা একটা ঐতিহাসিক সময়ের কথা বলে, যেমনটা রাঘবের উপন্যাসেও আছে। দ্বিতীয়ত, সাধু বাংলায় আসলে বিনোদিনী দুইখানা আত্মজীবনী লিখেছেন, এবং এই নাটকের শব্দগুলো সরাসরি সেগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং তৃতীয়ত, যারা প্রচলিত সংস্কৃত নাটকের রীতি জানে, যদি সবাই নাও জানে, সাইমনের বেশিরভাগ পাঠক/দর্শক বুঝবে যে—একজন নারী এই ভাষায় তাঁর নারীবাদী বিবৃতি দিচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত নাটকের নারী চরিত্রের মুখে প্রাকৃত ভাষা দেওয়া হতো, এটা বোঝানোর জন্য যে—তারা (নারীরা), সেইসব পুরুষ অথবা দেবতা, যারা

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত বিনোদিনী *নাটকে অভিনয়ে শিমুল ইউসুফ*

শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে কথা বলে, তাদের চরিত্রের চেয়ে কম মর্যাদাবান। সাইমনের এই নাটকের স্থান-কাল অবশ্যই কলকাতা বা সেই সময় যখন কলকাতায় পেশাদারী বাংলা থিয়েটারের প্রচলন হয়েছে এবং বিকশিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, *বিনোদিনী* নাটকের রচয়িতা একজন বাংলাদেশি।

সাইমনের পুরো সংকলনটি শুরু হয়েছে একটি শুরু করার মতো যথাযোগ্য নাটক *শুরু করি ভূমির নামে* দিয়ে। এবং সেখানে আমাদের একবারেই ভিন্ন এক ভাষার মুখোমুখি হতে হয়, এই নাটকের ভাষা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার আঞ্চলিক ভাষা। আমি এই কনফারেন্সের ওবেসাইট থেকে জেনেছি যে, সাইমন জাকারিয়া কুষ্টিয়া জেলার মানুষ। এই নাটকের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের রক্তঝরা মুক্তিযুদ্ধ, যা সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে, এমনকি তা এই নাট্যকারের জন্মের পূর্বে। কিন্তু নাটকটি বলছে—যে মাটিতে জনগণ দাঁড়িয়ে আছে সেই মাটিতে একদিন জনগণের রক্ত ঝরে পড়েছিল, সেই রক্তপাতের সম্মিলিত স্মৃতি এবং এই স্মৃতি আবিষ্কারের বিষয়কে নিয়ে এগিয়ে গেছে এই নাটক। এর ভাষা সাহায্য

কুষ্টিয়ার বোধন থিয়েটার প্রযোজিত শুরু করি ভূমির নামে

করছে বিষয়কে রক্তেভেজা মাটির কাছাকাছি নিয়ে যেতে, এই মাটি কুষ্টিয়ার মাটি, এবং এটাকে প্রকাশ করা হয়েছে কুষ্টিয়ার মানুষের মুখে ব্যবহৃত একটি বাগধারা দিয়ে। শব্দের অর্থ স্বভাবতই অতীতের বাস্তবতার বোধকে প্রকাশ করতে, অবশ্যই মুখ্য ভূমিকা পালন করে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার ভেতর দিয়ে অতীত যেন আরো বেশি করে বর্তমান হয়ে উঠছে, একটি বিশেষ আঞ্চলিকতার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত বিশেষ বাস্তবতা। এটা কেবলমাত্র উপর থেকে দেখা বাংলাদেশ নয়। এটা কুষ্টিয়ার প্রকৃত উচ্চারণে চল্লিশাধিক বছর আগেকার কুষ্টিয়ার এক ভয়ঙ্কর ঘটনা।

সাইমনের নাটক সংকলনের তৃতীয় নাটকের নাম *বোধিদ্রুম*, যেখানে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন ও বাঙালি পণ্ডিতদের কাছে বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ হিসেবে চিহ্নিত গীতিকবিতার সংকলন চর্যাপদের অনুসরণে বুদ্ধ-চিন্তার আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে। এই ধর্মীয় বাণী হিসেবে বিবেচিত গীতিকবিতাগুলি—যাকে সন্ধ্যাভাষা হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে—সাইমন এগুলোকে পাঠ করেন, যদি শুদ্ধ নাটক হিসেবে নাও হয়, কমপক্ষে সম্পর্কযুক্ত কবিতাগুচ্ছের আকারে মানবিক প্রেম কাহিনী হিসেবে।

তিনি তাঁর নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, তিনিই প্রথম নন যিনি পদগুলোর ভেতরে মানবিক প্রেমের গল্প দেখতে পেলেন, তিনি আমাদের এই পদগুলোর আবিষ্কর্তা পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দিকে মনোযোগী করে তোলেন, যিনি এই পদগুলোর উপর ভিত্তি করে উপন্যাস রচনা করেছিলেন এবং সাম্প্রতিককালে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের খ্যাতিমান উপন্যাসিক সেলিনা হোসেনও করেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

যাঁরা জানেন ১৯৮৬ সালে বিক্রম শেঠ *গোল্ডেন গেট* (সোনালী তোরণ) নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, তারা বুঝবেন যে, কীভাবে ধারাবাহিক গীতিকবিতার ভেতর দিয়ে একটা আখ্যান প্রকাশ করা যায়। প্রাক-আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এরকমই একটি কাজ, যেখানে ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে রচিত ধারাবাহিক গীতিকবিতার মাধ্যমে কৃষ্ণের কাহিনী বলা হয়েছে।

সাইমন তাঁর নাটকে অবশ্য গীতিকবিতার শরীর ব্যবহার করেন নি, তার বদলে তিনি চর্যাপদের শরীর খুঁড়ে সংলাপভিত্তিক নাটক রচনা করেছেন, যেখানে চর্যাপদের দুই নামি চরিত্র পরস্পরের সাথে কথা বলছে সোজাসাপ্টা চলিত

সেলিনা হোসেন

বিক্রম শেঠ

বাংলায়। এই চরিত্রগুলো যে প্রাক-আধুনিক যুগের তা ফুটিয়ে তোলার জন্য সাইমন মূল টেক্সট থেকে কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তিনি আমাদের জন্য, এবং অনুমান করি, তাঁর নাটকের দর্শকদের জন্য নাটকের শেষে একটি ছোট শব্দার্থ-তালিকা জুড়ে দিয়েছেন।

সাইমনের সংকলনে আরো পাঁচটি নাটক আছে এবং আমি নাটকগুলোকে আলাদা আলাদা করে পাঠ করবো না। এতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত পরোক্ষ উপমার সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়ার জন্য, যেমনটা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সচীক জাদুনগর* বোঝার ক্ষেত্রে সেটাকে একটি বর্ণনাময় জাদুঘর হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম, তেমনটাই আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাইমনের পুরো সংকলনটিকেও এক প্রকার জাদুঘর হিসেবে দেখার জন্য। অধিকন্তু, তাঁর স্বতন্ত্র নাটকগুলোকে এক একটি ডিওরমা হিসেবে ভাবতে বলবো, যেমনটা থাকে এই শিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়াম অফ ন্যাচুরাল হিস্ট্রির মতো জাদুঘরের বিভিন্ন ডিওরমায়। যাঁরা ডিওরমা শব্দটির সাথে পরিচিত নন, তাঁদের জন্য বলছি,

চর্যার সমকালে নির্মিত পাহাড়পুর (উপরে), ময়নামতি (নিচে) বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতিকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে বোধিদ্রুম নাটকের আখ্যান

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ডিওরমা হলো—এক ত্রিমাত্রিক প্রদর্শনী, যেখানে একটি দৃশ্য এমনভাবে তৈরি করা হয়, যে দেখে সেটাকে বাস্তব জীবনের মতোই সত্য মনে হয়, যদিও সেই জীবন, কিন্তু মিউজিয়ামের ডিওরমার ক্ষেত্রে, হতে পারে যে—তা ইতিহাস-পূর্ব কোনো অনুষঙ্গ, যা আমরা কেবল কল্পনা করতে পারি, কখনোই প্রত্যক্ষ করতে পারি না।

উপরে বর্ণিত তিনটি নাটকের ক্ষেত্রে, প্রথমটি অর্থাৎ *বিনোদিনী* নাটকটিকে আমরা ভাবতে পারি যে, এটা ১৯শতকের কলকাতার নাগরিক পরিবেশে অভিনেত্রী বিনোদিনীর এক বর্ণনাত্মক ডিওরমা। *ভক্ত কবি কুবির নাচে*-র ক্ষেত্রে, এই ডিওরমা আমাদের সামনে কুষ্টিয়া জেলার গ্রামীণ বাংলাদেশকে তুলে ধরছে। *সেইথ্রুম*-এ স্থানের ঐক্য অনির্দিষ্ট। কেননা, চর্যার টেক্সটগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিলো নেপালে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা এবং এই পদকর্তারা অনেক আগে বাস করতেন বাংলাদেশেরও পূর্বাঞ্চলে, সম্ভবত বর্তমান সময়ের কুমিল্লা ও অতীত কালের ময়নামতি অঞ্চলে। সেটা হলে, তিনটি রচনার ক্ষেত্রেই, সাইমনের সংকলনে, বাংলা টেক্সটের দূরতর এক বর্ণনাত্মক আনুষঙ্গের তিনটি বর্ণনাত্মক ডিওরমা বলা যায়।

দিল্লিতে সীতার অগ্নিপরীক্ষায় *আভেরি চৌরে*

ঢাকায় সীতার অগ্নিপরীক্ষায় *নাজনীন হাসান চুমকী*

আমি এক্ষণে বর্ণনামূলক জাদুঘর প্রসঙ্গ ত্যাগ করছি না, তবে আসুন আরো কিছু ডিওরমা দেখে নেওয়া যাক, একটি হলো হিন্দু সনাতন ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ এবং নিখিল বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ *রামায়ণ*-এর এক দৃশ্য ধারণকৃত সাইমনের *সীতার অগ্নিপরীক্ষা*-য় রাম চরিত্রকে প্রথাগত দৃষ্টির বাইরে থেকে আঁকা হয়েছে, এবং আমরা দেখি যে, রাবণের লঙ্কায় বন্দি হয়ে থাকার পর আপাত নিষ্ঠুর স্বামীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় রত সীতা। সাইমনের এই রামকে উপস্থাপনার সাথে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাম চরিত্রায়ণের অবশ্যই মিল আছে। সেই সঙ্গে আরো কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, মাইকেল ও সাইমন উভয়ের অঙ্কিত রামেই *রামায়ণের* পৌরাণিক নায়ক রামের সাথে মূলত পার্থক্য নেই, যদিও মাইকেল এবং সাইমন তাঁদের দুটো টেক্সটেই দর্শক/পাঠককে এবং তা নিঃসন্দেহে পরিকল্পিতভাবে সময়ত্তীর্ণ মহাকাব্যিক ঐতিহ্য থেকে ভিন্নতর স্বাদ দিতে চেয়েছেন।

আরেকটা ডিওরমা আশ্চর্যজনকভাবে একটা সাধারণ দৃশ্য, কিন্তু কিঞ্চিত প্রথাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্নও বটে। সাইমনের ইংরেজি নামের *অ্যা নিউ টেস্টামেন্ট অফ রোমিও এন্ড জুলিয়েট*-এ এমন এক দৃশ্য তৈরি করা হয়েছে

বরিশাল শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটারের অ্যা নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও এন্ড জুলিয়েট-*এর অভিনয়*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের প্রযোজনায় অ্যা নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও এন্ড জুলিয়েট

যেখানে একসঙ্গে দুটো ব্যাপার ঘটানো হয়েছে, বিশেষ করে জুলিয়েটের বিয়োগান্তক মৃত্যুকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। এই নাটকে জুলিয়েট চরিত্রকে এমন একটা জাদুকরি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে যে, সে মনে হচ্ছে মারা গিয়ে পরে আবার জিন্দা হচ্ছে, নাকি প্রকৃত অর্থেই জুলিয়েট মারা গেল তার কথাকথিত নিরাপত্তাদাতার হাতে, কারণ জুলিয়েট মরে গিয়ে না থাকলে পাদ্রি সাহেব বড় বিপদে পড়তো?

এটা নাটকের একটা চমৎকার ভিত্তি এবং এটা রামায়ণের উপর ভিত্তি করে লেখা নাটকটির সমান্তরাল, যেখানে বিবরণের এক পর্যায়ে যখন সীতা তার বীরোচিত স্বামীর সাথে পুনরায় মিলিত হওয়া নিয়ে ঘনিষ্ঠতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আসলেই সীতার জীবনে কী ঘটেছিলো।

প্রথাগত *রামায়ণের* ভিত্তিতে আমরা জানি যে, অনুমতি পেয়ে আযোধ্যায় ফিরে আসার পর থেকেই রাম ও সীতা সুখী জীবন-যাপন করতে পারে নি। আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে, সীতাকে একটি অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের মাস্টার্স অভিনয় কোর্সের শিক্ষার্থী-পরীক্ষার্থীদের পরিবেশনায় বোধিদ্রুম নাটকের একটি দৃশ্য

সাইমন জাকারিয়ার নাটক পাঠের আগে আমরা জানতাম না যে, অযোধ্যায় ফিরে আসার আগেও সীতাকে আরেকটি পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট নাটকগুলিতে দুই নারী চরিত্র সীতা ও জুলিয়েটকে সেগুলোর পুরুষ চরিত্রদের দ্বারা উপেক্ষিত দেখানো হয়েছে, এবং সেগুলো যেন পুরুষ রচয়িতা বাল্মীকি ও শেক্সপিয়রের উপেক্ষার শিকার।

সাইমনের সাহিত্যিক ডিওরমাগুলোর জাদুঘরে আরো অনেক কিছু দেখার আছে, যেমনটা কিনা রাঘবের জাদুনগর কলকাতায় আছে, কিন্তু এ বর্ণনামূলক জাদুঘর দুটোর কথা আমি এখন থামাবো। আমরা এ দুটোর সম্বন্ধে তখনই আরো অভিজ্ঞতা অর্জন করবো, যখন এগুলোর দোভাষী পাঠে মন দিবো।

ভারতবর্ষের সাহিত্য একাডেমির একটা মন্ত্র আছে: "ভারতীয় সাহিত্য হলো নানান ভাষায় লেখা একটি সাহিত্য"। আমার পরামর্শ হলো, আমরা এই মন্ত্রকে একটু পরিমার্জন করে নিয়ে বলতে পারি: "বাংলা সাহিত্য একটি, কিন্তু দুটো ভিন্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশে লেখা"। প্রধান দুটো ভূখণ্ড হলো ভারত ও বাংলাদেশ, কিন্তু আমরা সম্ভবত দেখি যে, বাংলার বাইরে রচিত বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি সব মিলিয়েই এই এক সাহিত্য। এখানেই আমার মন্তব্য শেষ করতে চাই, তার আগে সাহিত্য একাডেমির মন্ত্র একটু পরিবর্তন করে নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস *ঘরে বাইরে* থেকে একটু মশলা গ্রহণ করে বলা যেতে পারে: "বাংলা সাহিত্য একটি, যা রচিত হয় ঘরে অথবা বাইরে, অর্থাৎ বাংলার মাটিতে বা গোটা পৃথিবীতে"।

শিকাগো, এপ্রিল ২৭, ২০১২

আমেরিকার দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে ২৭-২৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত দুই বাংলা শীর্ষক দি নরম্যান কাটিল্যার কনফারেন্স অন সাউথ এশিয়ান লিটেরেচার-এ পঠিত কীনোট। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন—নূরননবী শান্ত। বর্তমান রচনাটি মূল-লেখক কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত।

খণ্ড ১, সংখ্যা ১ | ভাবনগর | আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 | BHABNAGAR | August 2014

বাউল গানের সুরবিচার

শক্তিনাথ ঝা

লালন সমাধি প্রাঙ্গনে সংগীত পরিবেশন করছেন
সাধক-শিল্পী মনোহর শাহ, তিনি বর্তমানে প্রয়াত

An Investigation of Baul Song Melodies

Shaktinath Jha

Abstract

This article examines the roots of Bangla Baul songs, specifically their distinct melodies and their history of compositions on a notated scale. Alongside is a discussion of the singers of Baul music. In actuality, the collecting of Baul songs, editing, compilation and analysis work as present in past research did not accurately make distinctions between Baulmusical melodic scales, aesthetics, singers and notation—such research has not yet been satisfactorily done. The avenue this article takes with regard to Baul song melodies is quite possibly the first to arranged in such a way. Specifically, this article describes the melodies of the ancient Buddhist spiritual songs *(sadhan-sangeet)* known as the Charyageete, specifically the songs' various scales and intended modes of singing. Beyond that, alongside there are descriptions of Vaishnava spiritual songs and the songs of Nath culture, specifically the important ways the music and the instruments are harnessed in a context of striving to realize the center of the human body. Essentially, these Bangla-language oral traditions have been carried on by Baul songs, and this article describes this as-yet unwritten history. Finally, the overall importance of each song's teaching and melody in the context of Baul sadhana is proposed and analyzed, in such a way as to highlight the immense importance of changes introduced by Baul song melodies and their singers. This article clarifies the two primary modes that Baul melodies and their singers can be proven to be connected with these changes in oral tradition, namely : 1) the musical instruments, and 2) the colloquial styles of pronunciation.

রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই বাউল গানের আলোচনা শুরু করা যাক। তিনি *প্রবাসী*র হারামণি বিভাগে কুড়িটি লালনের গান প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লালনপন্থীদের গান শুনেছেন, দেখেছেন পুরনো গানের খাতা। *প্রবাসী*র হারামণি বিভাগ (১৩২২, বৈশাখ) শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত গগনের 'কোথায় পাবো তারে' গান, দিনেন্দ্রনাথ কৃত এ গানের স্বরলিপি এবং গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দিয়ে। গানটি বহু পূর্বে সরলা দেবীর *ভারতী* (১৩০২, ভাদ্র) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। *প্রবাসী*র প্রথম প্রকাশের কথা ও সুরের ভ্রান্তি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সংশোধিত হয়েছিল। জোড় কলিগুলি একসুরে, বিজোড়গুলি অন্যসুরে এবং গানটি মিশ্র একতালায় গাইবার সংশোধনে সরলাদেবীর পাঠই গৃহীত হয়েছিল। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-এর *হারামণি*র (১ম খণ্ড) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অনেক রাগরাগিনীর সঙ্গে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন একসময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।" এ মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের কথা ও সুরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছেন।

ড. সুধাংশু শেখর শাসমল প্রায় ৫২টি রবীন্দ্র সঙ্গীতে বাউল সুরের প্রভাব চিহ্নিত করেছেন।[১] কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে বাউল প্রভাব আরও বহু বিস্তৃত। এ প্রভাব ভাষা, ছন্দ, মনন ও দর্শনের। নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আমার অনেক গান বাউল ধাঁচের। কিন্তু জাল করতে চেষ্টা করিনি, সেগুলি স্পষ্টতঃ রবীন্দ্র বাউলের রচনা।'[২]

বঙ্গভঙ্গের সমকালে ২২/২৩ গানে রবীন্দ্রনাথ বাউল সুর ব্যবহার করেছিলেন। (১) 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', (গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে'-র সুর), (২) 'ও আমার দেশের মাটি'-র সুর *শতগান*-এর 'আমার গৌর ক্যানে কেঁদে এল'-র অনুরূপ, (৩) 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', *শতগান*-এর 'মনমাঝি সামাল সামাল' স্বরলিপির অনুসারী এবং (৪) 'যে তোমার ছাড়ে ছাড়ুক', (৫) 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', (৬) 'যদি তোর ভাব

সরলা দেবীর স্বরলিপিকৃত শতগান *গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র*

থাকে' প্রভৃতি গান সরলা দেবীর *শতগান*-এর স্বরলিপির অনুগামী। *শতগান* (১৩০৭)-এ বাউল গানের স্বরলিপি শিষ্টজনের কাছে তুলে ধরেছিলেন সরলাদেবী। বাউল সুরের প্রাচীনতম সুরের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে সরলা দেবীর *শতগান* এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।[৩] রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত গান বঙ্গভঙ্গের সমকালে অতুল জনপ্রিয়তা এবং বিপুল জাতীয় আবেগ সৃষ্টি করেছিল। এ জনপ্রিয়তার আদিস্রষ্টা হলেন সুরস্রষ্টা বাউল সাধকেরা। রবীন্দ্রনাথ এ সুরের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনুভব করলেন যে, কথাকে সুরে পরিবেশনা করাই হলো বাউল এবং বাংলা লোকগানের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনিও কথাকে সুর দিতে গিয়ে প্রথাগত রাগরাগিনীর রীতিপদ্ধতি লঙ্ঘন করলেন। গানের আলোচনায় এ স্বাধীনতার তত্ত্বকে, মুক্তিকে চিহ্নিত করলেন রবীন্দ্রনাথ—'একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে তাহাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটি বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলি স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিনীর ও রাগিনীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকীগানের একেবারে গা ঘেষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিনী যত চোখ রাঙাক, সে কিসের কেয়ার করে? এই সুরগুলিকে কোন রাগ কৌলিন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না। স্পষ্ট বুঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলেতি সুর নয়।'[৪]

এখানে রবীন্দ্র-কথিত শিষ্টসুরের বাইরেও আদিবাসী গীতরীতি, শ্রমসঙ্গীত, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত গজল-কাওয়ালি প্রভৃতির তাল-লয়-সুর রয়েছে। শিয়াদের জারি এবং মর্সিয়া জারির নানা সুর বাউল গায়কেরা ব্যবহার করে। ব্যবহার করে স্বরলিপির বাইরেকার নানা মেয়েলিগান, মঙ্গলগান, ছড়া, ব্রত, পাঁচালী এবং আঞ্চলিক গানের সুর। দেশ-কাল-পাত্রানুসারে বদলে যায় গান। গায়ক তার স্বরচিত গানকে একাধিকবার একাধিক ভঙ্গীতে করেন। বিজয়গীতির রচনাকার ও সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া রেডিও-এর গান সংগৃহীত হয়েছে। এখন যারা বিজয়গীতির পরম্পরার গায়ক বলে প্রসিদ্ধ তাদের সুরের সঙ্গে এ সমস্ত গানের ভিন্নতা আছে। এ ভিন্নতার কারণ বর্ণনায় বাংলাদেশের বিজয় সরকারের ঘনিষ্ঠ এক অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন যে, বিজয় সরকার আসরেই অনেক সময় সুর দিয়ে গান করতেন। তার ঘনিষ্ঠ গায়কেরা তার কথাগুলি লিখে নিতেন। স্বরলিপি লিখিত হত না। তারা গাইবার সময় সুর এদিক ওদিক হয়ে শ্রুতি সুখকর হলে, সে গায়ককে বিজয় সরকার অভিনন্দন জানাতেন। লোকগান/বাউল গানের অজড় কোন স্বরলিপি থাকে না। লালনপন্থী সাধুসভায় দেখেছি যে, কথাতে ভুল করলে তা সংশোধন করে দেন। কিন্তু যে কোন শ্রুতি সুখকর সুরে গান গাওয়াতে কারো আপত্তি থাকে না। আমেরিকার পিটসিগার প্রমুখ 'পপগায়ক' এ রীতি পদ্ধতি স্বীকার করেন। বাংলার কীর্তনে একসময় এ স্বাধীনতা এসেছিল। গড়ে উঠেছিল মনোহরশাহী (৫৪ তাল), বর্ধমানে দ্রুতলয়ের রেনেটি (২৬ তাল), পদ্মাপাড়ে গরানহাটি (১০৮ তাল), আর ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ডী আঞ্চলিক কীর্তন রীতি। এর মধ্যে মান্দারনী, টেয়ার ছপ প্রভৃতি উপবিভাগ ক্রমে গড়ে ওঠে। কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট, ঝুমুর বিভাগে নানা বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করলে, বৈষ্ণব কর্তৃত্ব ধর্মাচারের মতই কীর্তনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ

বিজয় সরকার

করেন। এই অজড় কীর্তন রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন মুর্শিদাবাদের বাউল মতাদর্শের রূপচাঁদ অধিকারী এবং যশোহরের, বর্ধমানের আদিবাসিন্দা আদিবাসী কিন্নর গোষ্ঠীর মধুসূদন কিন্নর (মধুকান)। নারী গায়কদের অধিকার প্রসারিত হয় এ কীর্তন-ভাঙ্গায় বা ঢপকীর্তনে। শিল্পীর অনুভব এবং স্বাধীন প্রকাশের জীবন দর্শনই অন্য নামে বাউলচর্চা হয়ে ওঠে। আচারের, অচলায়তনের পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে তারা নতুন চরে বসতি গড়ে তোলে। এ অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ, পত্রপুটের ১৫নং কবিতায় লিখেছেন, 'কবি আমি ওদেরই দলে'। শিল্পীর এ স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সুবাদেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

"কীর্তন আর বাউলের গানে আমরা দিয়াছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।" *(আমরা, কুহু ও কেকা)*

বাউল গায়কদের অনেকে, কীর্তন-ঢপকীর্তন-ঘেটু-অষ্টক-নামসংকীর্তন-মনসা-জারি প্রভৃতি আঙ্গিকের সঙ্গে বাল্যে-কৈশোরে জড়িত থাকে। তাই উত্তরকালের বাউল গানে এগুলির অনিবার্য প্রভাব পড়ে। জারিগানে নিমগ্ন বিজয় সরকারের গানে জারির বিপুল প্রভাব আছে।

নির্দিষ্ট অঞ্চলের কথ্যভাষা এবং উচ্চারণরীতির সঙ্গে ছন্দের এবং সুরের সম্পর্ক আছে। কেমন>কম্‌নে, ক্যামনে উচ্চারণে মাত্রার হেরফের ঘটায়। নগেন্দ্রনাথগুপ্ত *বিদ্যাপতির পদাবলী*-র ভূমিকায় দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত শ্যাম উচ্চারণে বিদ্যাপতি-ব্যবহৃত 'সাম'-এর ছন্দ বদলে যায়। গবেষকেরা আঞ্চলিক

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ অঞ্চলের অষ্টক গান *পরিবেশনার দৃশ্য*

কথ্যভাষার উচ্চারণ রীতিকে অবলম্বন করেই বঙ্গের আঞ্চলিক সুর কাঠামো-ঝুমুর, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতিকে গড়ে উঠতে দেখেছেন। সহায়ক বাদ্যযন্ত্র এবং নাচ ও গানের রূপ ও রীতিকে প্রভাবিত করে থাকে।

দু'বঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় বাউল গান, গায়ক এবং পদকর্তাদের খুঁজে পাওয়া যায়। এরা হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান এবং আদিবাসী সমাজের প্রান্তবাসী। এদের উপর আঞ্চলিক কথ্যভাষা এবং তার উপরে গড়ে ওঠা সুর কাঠামো অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে জন্ম দিয়েছে বাউল গানের ঘরানা বা বিশিষ্ট গীতিরীতির। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার পূর্ববঙ্গীয় বাউল গানে নাচনেই (দেহভঙ্গী আছে)। ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মঙ্গল গান, রামায়ণ গান, মেয়েলী গান, শ্রমসঙ্গীত, মধ্যপ্রাচ্যের গীতরীতি এ অঞ্চলের বাউল গানে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। কীর্তনের নানা প্রকরণ সমস্ত বাউল গীতরীতিতেই অল্প বিস্তর প্রভাব ফেলে। লালনশাহী, মাইজভাণ্ডারী, রাধারমন, হাসন রাজার গান বিশিষ্ট ঘরানা সৃষ্টি করেছে এখানে। মাইজভাণ্ডারীর গান সারিন্দার ব্যবহারে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ময়মনসিংহ থেকে রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের বাউল গানে প্রভাব ফেলেছে চটকা-ভাওয়াইয়ার ঢং। এদের মুখ্যবাদ্যযন্ত্র দোতারা। বরেন্দ্রভূমির গানে একতারা-জুড়ির প্রাধান্য এবং কীর্তনের বিপুল প্রভাব আছে। গঙ্গার পশ্চিমে রাঢ়ে সানুচর চৈতন্যদেবের নৃত্যগীত শৈলীর অনুসৃত পদ্ধতিতে বিচিত্র নৃত্য বাউল গানের অপরিহার্য অঙ্গ হয়েছে। এ সুরে প্রভাব ফেলে ঝুমুর, সহায়ক বাদ্যযন্ত্র হয় গুবা। সাঁওতালি নাচ ও সুরকে দ্রুত লয়ে বদলে ব্যবহার করেন বহু শিল্পী।

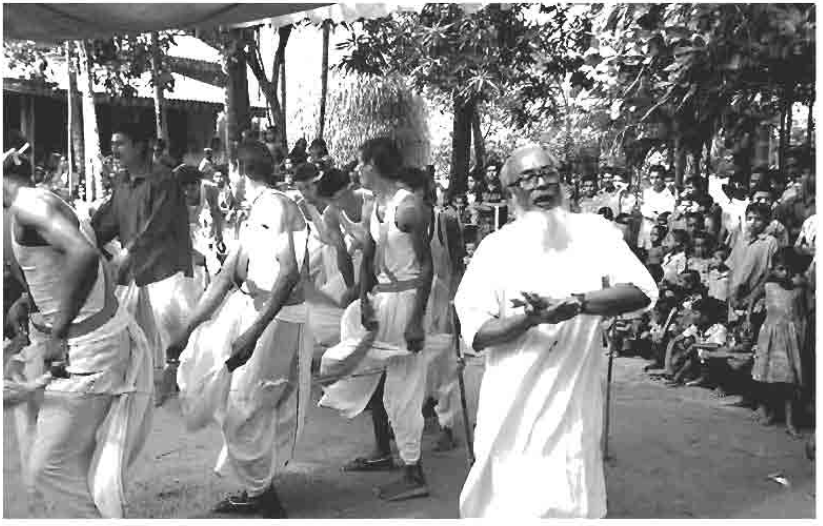

নেত্রকোণার কেন্দুয়া অঞ্চলের বিষাদ-জারি *পরিবেশনা*

চর্যাপদে যেমন গানের রাগ, তাল নির্দেশিত হয়েছিল, সে রীতি জলধর সেন সম্পাদিত, কাঙ্গাল হরিনাথের মুদ্রিত গানগুলি ছাড়া অন্য প্রকাশিত রচনায় বা গায়কদের খাতায় পাওয়া যায় না। জীবিতকালে নিজেদের গান মুদ্রিত করেন পাঞ্চু শাহ, দুদ্দু শাহ, গোঁসাই গোপাল, নবকিশোর গুপ্ত, হাল আমলে বাকুড়ার সনাতন দাস প্রভৃতি গায়ক-পদকর্তা। এরা কেউ পদের সূচনায় রাগ তালের নির্দেশ দেন নি। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালনের গানের খাতায় এ নির্দেশ নেই। সেকালের বাউল গানের সংগ্রাহকেরা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দুর্গাদাস লাহিড়ি, *প্রবাসী*র হারামণির সংগ্রাহকেরা বাউল গানের কথা মাত্র সংগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাউল গানের সুর সর্বদা মৌখিক ঐতিহ্য প্রবাহিত হতো। সাম্প্রতিককালের নানারকম বাউল গানের স্বরলিপি দেখা যায়। যেমন—ওয়াকিল আহমদ, আবুল আহসান চৌধুরী-র গ্রন্থে লালনের গানের স্বরলিপি, রাধারমনের, কর্তাভজাদের স্বরলিপি। এগুলি সবই নির্দিষ্ট কোন গায়কের গানের স্বরলিপি মাত্র। এগুলি পদকর্তা-গায়কদের কণ্ঠের গান থেকে করা নয়। নয় তাদের দ্বারা সমর্থিত বা অনুমোদিত স্বরলিপি। রাধারমনের দু'চারটি গানের স্বরলিপি করেছেন—সত্যব্রত ভট্টাচার্য এবং রাধারমনের গানের সংগ্রাহক মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, বিজয় সরকারের স্বরচিত গানের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে ভবা পাগলার কণ্ঠের গান। এগুলির সঙ্গে, পরম্পরার ঐতিহ্যবাহী শিল্পী বলে যারা দাবী করেন, তাদের সুরের বিস্তর ফারাক চিহ্নিত করা যায়। লালনের রচিত পদে তাল বিভাগের সূত্র পাওয়া যায় পর্বান্তিক মিলে; পদে এক দাঁড়ির অর্ধচ্ছেদে এবং দু'দাঁড়ির পূর্ণচ্ছেদে কলির সমাপ্তিতে।

ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে 'আলাপ, স্থায়ী, অন্তরা' ত্রিখণ্ড থাকে। লালনগীতির সূচনা 'অনাহত' আলাপ—গদ্যাত্মক বিবৃতিধর্মী। পরবর্তী কলিগুলি অন্তরা-তাল লয়ে বদ্ধ এবং পরিবেশিত হয়। কিন্তু এ গানে 'স্থায়ী' বা ধ্রুবপদ স্পষ্ট নয়। গায়কেরা ইচ্ছানুসারে কলিগুলিকে পুনরাবৃত্ত করেন। চর্চায় এ রীতিকে বলা হতো সমধ্রুবা। লালনের আখড়ার ভোলাই প্রমুখের গীতরীতিতে লালনের গান ত্রিখণ্ডে বিভক্ত। তাঁর গানের সূচনা বা ভূমিকাকে বলা হয় মুখপাত/উদ্ভব/ধরন। একাধিক পর্বে বা কলিতে গঠিত চরণটি একদাড়ি বা ঃ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত হয়। দ্বিতীয় চরণটির নাম পরধরণ/ধরণতরি/কোল ধরণী/কোল অন্তরা। প্রথম চরণের অনুরূপ এর গঠন। দু'দাঁড়ি দিয়ে এখানে পূর্ণচ্ছেদ চিহ্নিত হয়। এ দ্বিখণ্ডে গঠিত হয় মুখপাত বা উদ্ভব। সূচনার আকার ও আয়তন পরবর্তী 'কলি'/অন্তরার চাইতে এ অংশটি সচরাচর ক্ষুদ্রতর হয়ে থাকে। গায়কেরা এ অংশকে অর্ধকলি/আধকলি হিসাবে গণ্য করে থাকেন। লালনগীতির সূচনাটি বিবৃতিধর্মী, তালমান বহির্ভূত, অনাহত আলাপ। এরপর থাকে একাধিক কলি/অন্তরা। বৈষ্ণব ঐতিহ্যে তাল দ্বারা নিয়মিত পদাংশকে বলা হয় কলা। একাধিক কলা দিয়ে রচিত হয়—কলি বা কলিকা। কলিকার সংখ্যার নানা রকমফেরে (প্রায় ছ'প্রকার) নানা বৈচিত্র্য সৃজিত

হয়। কলিকা হয় স্বল্পচ্ছেদ—কলি হলো গানের ছেদ। কবিতার পূর্ণচ্ছেদে যেমন চিহ্নিত হয় চরণ, কলির পূর্ণচ্ছেদ তারই সমতুল্য। *প্রবাসী*-র রবীন্দ্র প্রকাশিত 'মনের মানুষ' গানটির সংশোধিত পাঠে 'কলি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দু'দাঁড়ি দিয়ে সুচিহ্নিত হয়েছে কলি বিভাগ এবং কলির সূচনায় বাম দিকে সংখ্যা বসিয়ে (১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি) কলির সংখ্যা নিরূপিত হয়েছে। এ কলি বিভাগ বাউল সাধক গায়কদের খাতায় পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (*ভারতী*, ১৩০২ ভাদ্র) 'সব লোকে কয়' গানটি এই সংখ্যা চিহ্নিত কলি বিভাগেই প্রকাশিত করেছিলেন। সরলা দেবী গানের স্বরলিপিতে কলি বিভাগ রক্ষিত হয়েছে। জলধর সেনের প্রকাশিত ফিকিরচাঁদের গানে রাগ তালের উল্লেখ আছে। আছে সংখ্যা দিয়ে কলি বিভাগ। কিন্তু গোঁসাই গোপালের প্রকাশিত গানে, কর্তাভজাদের ভাবের গীতে, পাঞ্জু শাহ-র *ছহি ইস্কে ছাদেকী গওহোর*-এ, ভোলাই-এর খাতায় কলি বিভাগ আছে। কিন্তু কলিগুলি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত নয়। উত্তরকালের অনুসারীরা, গায়কেরা কলিরগুলির ক্রম এবং সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্যই সংখ্যা দিয়ে সেগুলি চিহ্নিত করেছিলেন। লালনপন্থীদের গানের খাতায় সূচনার অনাহত/মুখপাত কলি বিভাগের বহির্ভূত। অনেকে এক 'অর্ধকলি' হিসাবে গণ্য করেন, কিন্তু সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করেন না। জলধর সেন সূচনাংশকেও কলি এবং সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করেছেন।

লালনগীতি সচরাচর তিন কলির (সাড়ে তিন) হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু ভাবের গীতের মত ১০ কলির বেশি পদ লালনে নেই। এই সাড়ে তিন—দেহনির্গত মূলবস্তু এবং মহাপ্রভু চৈতন্যের অন্তরঙ্গ সাড়ে তিন জনার কথা স্মরণে আনে। লালনের পর্বান্তিক ছেদ বা কলিকাগুলিতে অন্তমিল থাকে এবং

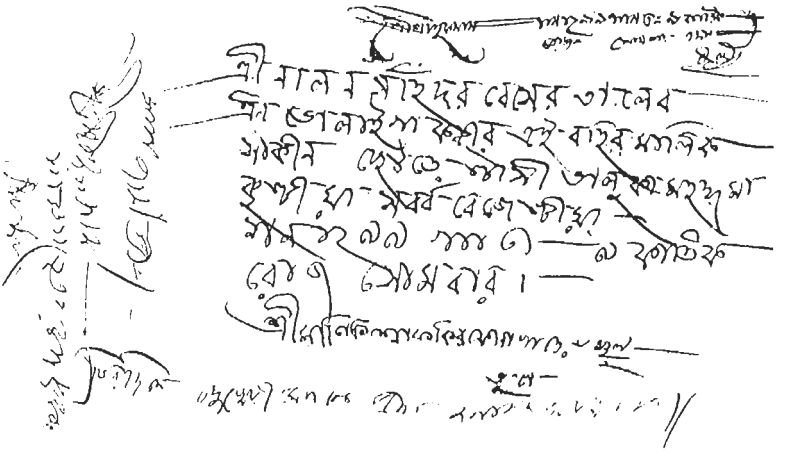

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত লালন সাঁইজির ভক্তদের হস্তাক্ষরে গানের খাতার প্রথম পাতা

থাকেও না। কিন্তু তার গানের সূচনার অন্তে এবং কলির অন্তে অনিবার্য অন্তমিল ব্যবহৃত হয়। সাড়ে তিন কলিতে আমরা পাঁচটি মিত্রাক্ষর পাই। প্রচলিত গানের খাতায় গদ্যের মত টানা পংক্তিতে বিন্যস্ত থাকে গান বা কবিতা। দু'দাড়ি দিয়ে সু চিহ্নিত থাকে চরণান্তিক ছেদ এবং থাকে অনিবার্য মিত্রাক্ষর।

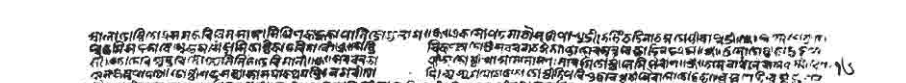

আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম[১] সাঙ্গ।
নিঘিণ ক(া)হ্নু[২] কাপালি জোই লাগ[৩] ॥ ধ্রু॥
এক সো পদমা[৪] চৌসঠ্ঠী[৫] পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ[৬] ডোম্বী বাপুড়ী[৭] ॥ ধ্রু॥

হালো[৮] ডোম্বী তো পুছমি[৯] সদ্‌ভাবে।
অইসসি[১০] জাসি ডোম্বী কাহরি[১১] নাবেঁ॥ ধ্রু॥
তান্তি বিকণঅ[১২] ডোম্বী অবর না[১৩] চঙ্গেতা[১৪]।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া[১৫] ॥ ধ্রু॥

তু লো ডোম্বী হাউ[১৬] কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি[১৭] হাড়েরি মালী॥
সরবর ভাঞ্জীঅ[১৮] ডোম্বী খাঅ[১৯] মোলাণ[২০]।
মারমি ডোম্বী[২১] লেমি পরাণ॥ ধ্রু॥

তমেবার্থং নৈরাত্মধর্ম্মাধিগমেন কৃষ্ণপাদাঃ॥ ডোম্বী শব্দ সন্ধ্যাভাসয়া কথয়ন্তি॥ নগরীত্যাদি।[২২] অস্পৃশযোগত্বাৎ।[২৩] ডোম্বীতি পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা বোদ্ধব্যা॥ ব্রহ্মাণেতি।[২৪] ব্রহ্মহূংকার বীজজাতং চপল যোগত্বাৎ চিত্তবটুকং অসংপ্রদায়যোগিনাং বোধিচিত্তং সংবৃত্তিশুক্ররূপং মণিমলাদ্বিরমানন্দাৎ স্পৃষ্ট্বাস্পৃষ্ট্বা গচ্ছসি[২৫] ভো নৈরাত্ম্যা।[২৬] নগরিকেতি।

নীলরতন সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি কোষ গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

ধীর লয়ে গদ্যাত্মক বিবৃতি দিয়ে শুরু হয় লালনের গান। তারপরে সুর লয়ে তালে কলিগুলি গীত হতে থাকে। গায়ক স্মরণ রাখেন কলির ক্রম এবং সর্বমোট সংখ্যা। পদ্মা-ভাগীরথীর বদ্বীপে লালনের আখড়ার স্টাইলে গানের সুর সমাপ্তিতে চরম দ্রুত চালে গীত হয় এবং দ্রুততম চরমে উঠে সমাপ্ত হয় গান। চর্যায় গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। তারা নিজস্ব মণ্ডলিতে নৃত্য-বাদ্য সহযোগে গান করতেন। নেপালের ব্রজাচার্যেরা এখনও চাঁচাগান করেন। বাংলাদেশের সাইমন জাকারিয়া তা নিয়ে কাজ করছেন।[৫] নেপালের লুম্বিনী বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত করেছেন।[৬] এ সমস্ত গান অবশ্য বিবর্তিত হয়ে আধুনিক রূপ লাভ করেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগানকে বলেলেন, 'বৌদ্ধ সঙ্কীর্তন'। এদের ব্যবহৃত পটমঞ্জুরি, বরাড়ী, গুঞ্জরি, শীবরী, কামোদ, মল্লারী, দেশাখ, ভৈরবী, মালসী, গবুড়া, রামক্রী, বঙ্গাল ইত্যাদি রাগ রাগিনী বৈষ্ণব-কীর্তনেও স্থান পেয়েছে।[৭] এ সমস্ত গীতিরীতির ভগ্নাংশ বাউল গানে না থাকার কারণ নেই। চর্যার বহু পারিভাষিক শব্দ, উল্টাভাষা, ইহদেহের সাধনা, আচার-শাস্ত্র-ধর্মীয় কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করার রীতি পদ্ধতি বাউল গানেও অবিকল খুঁজে পাই। নৃত্যে-গীতে-বাদ্যে সিদ্ধাচার্যদের মত বাউলেরও নিবিষ্ট। আর বৌদ্ধতন্ত্রের সহজ-সাধনা বৈষ্ণব সহজ-সাধকদের মাধ্যমে বাউলেরা গ্রহণ করেছিল। বাউলের কাছে চৈতন্যদেব মান্য। রাধাকৃষ্ণ তো বাউলগানের সর্বাঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে। ভ্রাম্যমান বাউল ফকিরেরা শৈব-তান্ত্রিক, বেসরা সুফি-সাধকদের এবং ভক্তি-ধর্মের নানা ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বাউল গানে এদের নানা নাম, প্রতীক-রূপক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বহির্বঙ্গের কিছু বাদ্যযন্ত্রও গৃহীত হয়েছিল বাউল পন্থায়।

লালন সাঁই নিজেদের তৈরি লাউয়া একতারা (তন্ত্রী) হাতে নিয়ে গান করতেন। সহযোগী সাধুরা বাজাতেন খোল, প্রেমজুড়ি এবং লোহার চিমটা। সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্যের ভঙ্গিতে তাতে ছিল সহজ সুরের প্রাধান্য। যশোহর জেলার মহেশপুর থানার বালিশা অমূল্য শাহ, যিনি কর্তাভজাদের দলভুক্ত থেকে 'আইন গান' করতেন, পরে তিনি লালন শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহ-র শিষ্য হরিনারায়ণপুরের খোদাবক্স শাহ-র শিষ্যত্ব নেন (খোদাবক্সের মৃত্যু ১৯৪৭)। অমূল্য শাহ গীতবাদ্য শেখার জন্য ভারতের উত্তরপ্রদেশ-দিল্লিতে গিয়েছিলেন, কয়দিন সে অঞ্চলে থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অভিজ্ঞানে এবং অঙ্গনে দক্ষতা লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি সুফিসন্তদের রীতিতে, গলায় ঝোলানো মালা, পায়ে নূপুর এবং ডান হাতে একতারা নিয়ে অনুরাগী সঙ্গীতে মাতিয়ে তোলেন যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলকে। তাকে 'গীত সম্রাট' বলা হতো। বিখ্যাত গায়ক ও পদকর্তা জহুরুদ্দীন শাহ, খোরশেদ শাহ, নিমাই শাহ তাঁর শিষ্য ছিল। অমূল্য এবং অনুগামীদের হাতে লালনগীতির বাদ্যযন্ত্র এবং পরিবেশনরীতির রূপান্তর ঘটে যায়। উত্তরকালে কালু শাহ, মহির শাহ, খোদাবক্স শাহ (আফরাপুর), মকছেদ আলী সাঁই অমূল্যের পরম্পরাকেই দৃঢ় ও ব্যাপ্ত করেন। মকছেদ আলী সাঁই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, রাগসঙ্গীত, নজরুল গীতির দক্ষ শিল্পী ছিলেন। ১৯৬০ সালের তিনি লালন-গীতির চর্চা শুরু করেন। তিনি নানা বাদ্য সহযোগে নিজস্ব ঢঙে লালনের গান পরিবেশন করতেন। তিনি ঢাকা বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি এবং খোদাবক্স শাহ, সুধীন দাশকে ২৫টি

বাউল সঙ্গীতের অমর সাধক শিল্পী খোদাবক্স শাহ

মকছেদ আলী সাঁই

ভাবনগর ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাধু পরিবারের গান শীর্ষক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন নহির ফকির

লালনগীতির স্বরলিপি করতে সাহায্য করেছিলেন।[৮] খোদাবক্স শাহ বাংলাদেশের শিল্পকলা একাডেমীর লালনের গানের প্রশিক্ষক ছিলেন। তিনি লালনগীতিতে রাগসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, কীর্তন, ধুয়াজারি প্রভৃতি সুরের ধাঁচা চিহ্নিত করে, তদনুরূপ স্বরলিপি এবং সুর করেছিলেন। তার কৃত স্বরলিপি অনুসৃত হয়েছে চন্দনা মজুমদার, ফরিদা পারভীন প্রমুখের গানে। এ গোষ্ঠীতে শাস্ত্রীয় রীতিতে গান গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে লালনের আখড়ার ভোলাই, শীতল প্রমুখ সমস্ত অনুগতের রীতিকে স্বীকার করে একতারা হাতে প্রাচীন রীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। এটিকে 'খেঁউড়িয়া' ঘরানা বলা হতো। ভোলাই, ইয়াসিন, মোতাহার খন্দকার এবং তাদের অনুগামী সাধক গায়কেরা এ পরম্পরাকে অনুসরণ করে চলেছেন। গৌতম ঘোষের 'মনের মানুষে' এ দু'পরম্পরায় গান স্থান পেয়েছে।[৯]

জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস এবং আরো অনেকের মতে, বাউল এক লৌকিক রাগিণী অথবা লোকসঙ্গীতের সুর বিশেষ (বাংলা ভাষার অভিধান)। সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী ফিকিরচাঁদী বাউল গানের সুর বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, সেখানে বিলাবল রাগের প্রভাব। কিন্তু বিলাবলের গাম্ভীর্য এখানে ছন্দ-বাহুল্যে, নাচে, তাল-বৈচিত্র্যে এবং তান ফেরতায় বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। বিলাবল অঙ্গের, বিভাসের কোমল নিষাদ এখানে ঝিঁঝিটের মতো ব্যবহৃত হয়। এসব গানের মূল ভণিতা থাকে পূর্বাঙ্গে এবং সেখানেই সূচিত হয় সুরের ভিন্নতা। এ সমস্ত গানে চারটি রীতি দৃষ্ট হয় (১) সরমপ দিয়ে, (২) সপধপ, (৩) সরগপ দিয়ে আরোহণ; (৪) সরগমপ করে পঞ্চম পর্যন্ত আরোহণ। গ্রহ, অংশ, ন্যাস সূত্রানুসারে কোন রাগের প্রথম সূচনা কোন একটি বিশেষ স্বরে ও বিশিষ্ট স্বর সন্দর্ভে এসে দাঁড়ালে তার পূর্ণ রূপ প্রকাশ হয়।[১০]

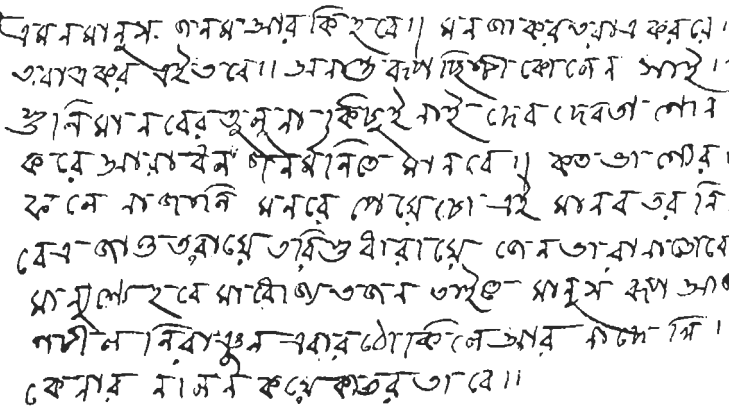

লালনের সাক্ষাৎ শিষ্যের হস্তাক্ষরে
রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালনের গানের খাতার একটি পৃষ্ঠা

তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি লালনের গানে কলিগুলি মিত্রাক্ষরে বদ্ধ থাকে। এখানে থাকে পর্বান্তিক সমান্তরাল মিত্রাক্ষর। অযুগ্ম পর্বে অমিত্রাক্ষর দিয়ে তিনি ছন্দের অতি লালিত্য ভাঙ্গেন। অসম পর্বিক কলি দিয়ে, পর্বের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন ধ্বনি-বৈচিত্র্য। কলিতে অতিপর্ব ব্যবহার করে তিনি সৃষ্টি করেন ছন্দের উপলব্যথিত গীত। লালনের পদের ছন্দ-বিন্যাসের সঙ্গে তার সুর কাঠামোর সম্পর্ক আছে। ওয়াকিল আহমদ লালনের গানে চারটি অংশ দেখেছেন আস্থায়ী/ধুয়া, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। ধুয়ায় মূল ভাবের সূচনা, অন্তরায় তার বিবরণ, সঞ্চারিতে বিস্তার এবং আভোগে ভনিতাসহ পরিসমাপ্তি। ওয়াকিল আহমদের মতে, ধীরলয়ের ভাটিয়ালি, লালনের তত্ত্বসঙ্গীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যেমন—'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে' বা 'বড় সঙ্কটে পড়িয়া দয়াল'; অন্যদিকে 'তিন পাগলে হল মেলা', 'আমার মনের মানুষের সনে মিলন হবে কতদিনে' প্রভৃতি গানে কীর্তনের দ্রুত লয় প্রভাব ফেলেছে। তিনি *বাউল গান*[১১] গ্রন্থে কয়েকটি গানের স্বরলিপি দিয়েছেন।[১২]

আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকগানে স্বরপঞ্চককে দেখেছেন। কিন্তু বাউল গানে স্বরসপ্তক আছে। ড. অরুণ বসু প্রচলিত বাউল সুরে দেখেছেন ঢপকীর্তনের রীতি এবং দাশরথি রায়ের *পাঁচালী*র চলন, উপরন্তু ফিকিরচাঁদী ঢং। সুধাংশু শেখর বলেছেন, "ফিকিরচাঁদী সুরের কাঠামো হলো—স স সর, গ। ধন, ধ র্স, র্স, নধপ, পমগ, গর, রসম, গরস। কসৌ লি ঝিঁঝিটের চাইতে বিলাবলের রাগ রূপ এতে বেশি প্রতিফলিত। ভাটিয়ালি চড়া সুরের গান। তার স্বররূপে ঝিঁঝিটের স্বারূপ্য আছে। কিন্তু বাউল বা কীর্তন গানের সঙ্গে সামান্য নাচের ভঙ্গিগত সম্পর্ক থাকায় এ সুরকে মধ্য সপ্তকে বা পূর্বাঙ্গে রাখতে হয়।"[১৩]

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীও সুরেশচন্দ্রের মতো মৃত্যু বা ছন্দ-বাহুল্যে বিলাবলের গাম্ভীর্য ভঙ্গিতে দেখেছেন বাউল গানে। তার মতে, 'জাত গেল জাত গেল বলে' লালনগীতিটি ঝাপতালে রচিত। বাউলগানে তিনি বেহাগ, খাম্বাজ, ভৈরবী, বিলাবল প্রভৃতি রাগ রাগিনীর প্রভাব দেখেছেন। খাম্বাজ এবং পিলু সুরের, ভীমপলশ্রী, পটদীপ রাগের সঙ্গে মিলযুক্ত; খাম্বাজ, কাফি ঠাটের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ভাটিয়ালির প্রাধান্য চিহ্নিত করেছেন তিনি বাউল গানে। তার সিদ্ধান্ত, "বাউল গানের কোন সুনির্দিষ্ট সুর নেই। কোন কোন রাগের ছায়া অনুসৃত হলেও সারি-ভাটিয়ালির সুর অবলম্বনেই বাউল গান রচিত।"[১৪] অথচ রবীন্দ্রনাথ বাউল সুরের কথা বলেছেন। এ সুর অবলম্বনে গান রচেছেন নজরুল। মৃদুলের বক্তব্য পূর্ববঙ্গের বাউলগান (নাগরিক রূপ) সম্পর্কে আংশিক সত্য। সমগ্র বাউল গান সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সরলা দেবীর *শতগান*-এর স্বরলিপি, রবীন্দ্র সমর্থিত হারামণিতে প্রকাশিত স্বরলিপি, ইন্দিরা দেবী এবং তৎপরবর্তী সমস্ত বাউলগানের স্বরলিপিগুলি কোন নির্দিষ্ট গায়কের নির্দিষ্ট স্থান-কালে গাওয়া গানের ভিত্তিতে করা হয়েছে। সাধক গায়কমণ্ডলির অতি গভীরে গিয়ে কেউ এগুলি সংগ্রহ করেন নি। একই গানের অন্যসুর ছিল কিনা—তাও খোঁজেন নি কেউ। গ্রাম-গঞ্জে শহরে জনপ্রিয় গায়ক এবং তাদের গান অবলম্বনে এ সমস্ত স্বরলিপি হয়েছিল। বিখ্যাত পদকর্তাদের অনুমোদিত নয় এ সুর। এর ব্যতিক্রম ফিকিরচাঁদের জীবিতকালের অনুমোদিত রাগতালসহ গীতাবলি। তাঁর এবং সখের বাউলদের গানগুলি রাগসঙ্গীত ঘেষা। রাঢ়ে-বঙ্গে আরও বহু গীতরীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত সুর

পশ্চিমবঙ্গের বাউল শিল্পী-সাধকদের সঙ্গে গবেষক শক্তিনাথ ঝা

গ্রহণ করেছিলেন, সরলা দেবীর যে স্বরলিপি করেছিলেন তার মধ্যে লুপ্ত বাউল গানের ভগ্নাবশেষ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আর পরম্পরার ঐতিহ্যে খোঁজা যেতে পারে মাটির সুর। কিন্তু বাউল গানের স্বরলিপি, ধ্রুপদী গানের মতো অনড় এবং অভ্রান্ত মর্যাদা পেতে পারে না।

অধুনা রচনাকারের সঙ্গে সুরকারের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। পদকর্তা-গায়কের অথবা পরম্পরার প্রখ্যাত গায়কের নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট গানের যে স্বরলিপি করা হয়, পরবর্তী সময়ে সে গানে ঈষৎ ভিন্নতা দেখা দেয় লোকগানে। বিজয় সরকারের মতো পদকর্তারা সুরের সুচারু পরিবর্তিত ব্যবহারকে স্বাগত জানাতেন। নিরক্ষর গায়ককে খাতা থেকে পদটি পড়ে দেন সহকারী। বাউলগানের ভাষিক পাঠ স্মৃতিতে অথবা হাতে লেখা পরম্পরার খাতায় রক্ষিত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক পাঠ, সুর-লয়-তাল মৌখিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশ নির্ভর হয়ে থাকে। এ কারণে নাটকে, বাউলাঙ্গের গানের গীতরীতির নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বাউলের সুর অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত বাউল গানের সুর। শিষ্ট স্বরলিপির অনড় বন্ধন থাকে না বলেই এ শ্রেণীর গানে গায়কের আত্মপ্রকাশের সুযোগ অধিকতর।"

বাউল গানের/লোকগানের ভাষিক পাঠের সঙ্গে সাঙ্গীতিক পাঠের সংগ্রহে গুরুত্ব দিয়েছেন শেখ মকবুল ইসলাম।[১৫] অনেকে এ সুর সংরক্ষণের মাধ্যমে পরম্পরার ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে চান। কিন্তু খালেদ চৌধুরী জানিয়েছেন যে— (১) এ সুর বিন্যাস 'শ্রুতি পরম্পরার গান'। 'গায়কেরা এ গান গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে শেখে। স্কেলটা ঠিক রাখে। পদের কলিগুলির হিসাব রেখে ক্রমে গায়। এ গানের কাব্যরূপ, দর্শনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা বেশি; সুর-তালের আলোচনা ও বিশ্লেষণ কম।'[১৬] রচনাকারের স্বরলিপি বা স্বকণ্ঠের গানের অভাবে এ বিশ্লেষণের অভাব। এ কারণে সঙ্গীতজ্ঞরা ফিকিরচাঁদী সুরের বিশ্লেষণে মনোযোগ দিয়েছেন। খালেদ চৌধুরী লোকগানের স্বরলিপির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেছেন। (১) এ স্বরলিপি নির্দিষ্ট কোন গায়কের দেশ-কালে গীত-সুরের এক স্থানুরূপকে তুলে ধরে। ব্যক্তি এবং অঞ্চলভেদে এ গানের চলমান বৈচিত্র্য স্বরলিপিতে হয় উপেক্ষিত; (২) স্বরলিপিতে স্বর প্রকাশিত হয়, কিন্তু শ্রুতি বা গায়নরীতি প্রকাশিত হয় না। আমরা জানি যে, বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অনেক সময় গানের চলনে প্রভাব ফেলে; আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি বদলে দেয় গানের সুর। মঞ্চ, দর্শক, পরিবেশ এবং হাতের যন্ত্র, পায়ের নূপুর, নৃত্য-দেহভঙ্গি গানের উপর প্রভাব ফেলে। বাউল গায়ক নাচের মুদ্রায়, গানের সময় নানা অঙ্গভঙ্গিতে, পায়ের নূপুরের তালে অথবা খঞ্জনির তালে, হাতে বাদ্যযন্ত্রে সুর ধরে রেখে নৃত্যগীত-বাদ্যের এবং একক অভিনয়ের এক পূর্ণ রূপকে তুলে ধরে। যথার্থ বাউল গান কেবল শ্রাব্য নয়; দৃশ্যও বটে। গায়ক যখন সাধক হন, তখন তিনি কথার অন্তর্নিহিত ভাবকে নাচে, সুরে, মুদ্রায়, কথকথায় মূর্ত করে তোলেন। প্রত্যক্ষ দেখা-শোনায় অথবা ভি.ডি.ও ডকুমেন্টসনে বাউল গান

নিজেকে যথার্থ উদঘাটিত করে। গায়ক যখন সাধনার-বহির্ভূত ব্যক্তিত্ব হন, তখন তার গানে বাহ্যিক সুর-বৈচিত্র্য প্রধান্য লাভ করে, কিন্তু আমাদের অভিভূত করে না। জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায়—

মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, এলোমেলো নিরাশ্রয়—
শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে...।[১৭]

দীপক মজুমদার বোলপুরের রামানন্দ ক্ষ্যাপার এমন এক গান শোনার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সুরের চারুত্ব এবং চাতুর্যের সমান্তরালে বাউল গানের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুর গুরুত্বেই বাউল গান রবীন্দ্রনাথসহ বহু শিষ্ট বুদ্ধিজীবীকে আকর্ষণ করেছিল। তারা এ পদাবলির সমাজতত্ত্ব, দর্শনের বিচারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। চর্যাপদগুলির তত্ত্বদর্শন ব্যাখ্যা করার জন্যই মুনিদত্ত রচেছিলেন 'নির্মলগিরা' টীকা এবং তার তিব্বতি অনুবাদও হয়েছিল। বাউল পাদাবলিকে সাধনার প্রয়োজনে, জীবন চর্যার নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন সাধকমণ্ডলি। লালনাদি তাদের কাছে 'মহাজন/পথপ্রদর্শক'। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণে মন্তব্য করেছেন, "সুরের সাহায্য নিয়ে কথার ভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করা প্রাচীন বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য ছিল। কাব্যরচনা তার মুখ্য উদ্দেশ্য, সুর সংযোগ গৌণ।"[১৮] অন্যদিকে গানের সুর, লয়, তাল, ছন্দোরীতি বাউল গানের কথার বিন্যাসকে প্রভাবিত করতো। এ ভাষায় মিশে থাকে সুরের নক্সা। গানের পদাংশ ধ্রুবপদের মতো পুনরাবৃত্ত হয়। গায়ক 'আখরের মতো' শব্দ যুক্ত করে (হায়রে, মরি হায় হায়, ও ভোলা মন ইত্যাদি)। প্রশ্নোত্তরী গানে যুক্ত করে ব্যাখ্যামূলক কথা। লালনের "আমি একদিনো না দেখিলাম তারে" পংক্তিটি সাধক-গায়ক "আমি একদিনো না, না দেখিলাম তারে" পরিবেশনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। (ফরিদা পারভীনের ক্যাসেটে 'এক' হয়েছে 'একঘর'। পড়শী একজনই। গানে আছে একের বর্ণনা।)

শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ এবং ভাষারীতি লোকগান এবং বাউল গানের সুরের নক্সার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কথ্যভাষার উচ্চারণরীতি এবং ধ্বনিগত পার্থক্য এ সমস্ত গানের সুরের বিশিষ্টতার সঙ্গে যুক্ত। ভিন্ন কথ্য ভাষার উচ্চারণে বা শিষ্টভাষায় পরিবেশিত হলে এ সমস্ত গানের ছন্দ পাল্টে যায়। চট্টগ্রামের গান বাকুড়ার উচ্চারণে আলাদা হয়ে যায়। ভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণের ধ্বনি পরিবর্তনে ঘটে যায় সুরের পরিবর্তন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দেখেছেন যে, *বিদ্যাপতির পদাবলি*-তে পূর্বনির্দ্দিষ্ট রাগ-তালের নির্দেশ নেই। "গায়ক যে রূপ ইচ্ছা সুর বসাইয়া গান করিতে পারেন। কিন্তু পদাবলীর সকল শব্দ মাত্রাত্মক। সংস্কৃত বানান বা উচ্চারণ

রীতি এখানে রক্ষিত হয় না। এ শব্দ বা বানান বদলালে মাত্রা রক্ষা হবে না।"[১৯] পূর্ববঙ্গের উচ্চারণরীতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ভাটিয়ালি, উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষার উচ্চারণ স্বীকার করে ভাওয়াইয়া, রাঢ়-মালভূমের উচ্চারণের ভিত্তিতে ভাদু-টুসু-ঝুমুর এবং মধ্যবঙ্গের শিষ্ট ভাষাদর্শের দৃষ্টান্তে কীর্তনের সুর নির্মিত হয়েছে। এ সমস্ত আঞ্চলিক সুর কাঠামো আঞ্চলিক বাউল গানে গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রও প্রভাব ফেলেছে বাউল গানে। বিলম্বিত মীড়াশ্রয়ী এবং লীলায়িত কীর্তনাঙ্গের বাউল গানে একতারা, খোল বা জুড়ি ব্যবহৃত হয়। দ্রুত লয়ের ঝুমুরে তাল প্রধান, কাটাকাটা, ঝটকা দেওয়া ত্রিমাত্রিক ছন্দে খমক (গুবা), দোতারা, খঞ্জনির (ডুবকী) অনুগমন চিহ্নিত করা যায়। শ্রীহট্ট-চট্টগ্রামের মুর্শিদি-মারফতী গানের নৈকট্য একদিকে জারি-কাওয়ালি-ভাওয়াইয়া-চটকার সঙ্গে। অন্যদিকে বিনত প্রার্থনা, মনঃশিক্ষার আত্মমগ্নতা, তাল বিহীন একতারা-সারিন্দার সুর ধরে পরিবেশিত হয়।

পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার বাউল গানে দেহভঙ্গি আছে; নাচনেই। ভাটিয়ালি-সারি-জারি-মঙ্গল গান-মেয়েলি গান, ঢপকীর্তনের নানা অঙ্গ এখানকার বাউল গানে মিশেছে। এখানে মধ্যভারতের ভক্তিগীতির সুর ও যন্ত্র ব্যবহার চিহ্নিত করা যায় (অমূল্য শাহ-র মাধ্যমে লালনগীতিতে)। লালনপন্থীদের বেশ সাদা। অনেকে গেরুয়া, হলুদ (কালাচাঁদীরা) বস্ত্র ব্যবহার করেন। দরবেশদের কেউ কেউ

লালন সংগীত পরিবেশন করার সময় শিল্পীদের খাতা ব্যবহারের নমুনা

আলখেল্লা, সাদা হাল, তসবি মালা, নানা বীজ-পাথর-বৃক্ষ খণ্ড দিয়ে তৈরি মালা, ফলের শক্ত খোসা দিয়ে তৈরি পানপাত্র, কড়োয়া, দরিয়ার ফলের নৌকা ব্যবহার করে থাকেন। এখানকার মনসুর রসিকদের 'আল চিস্তি' ঐতিহ্য সুরে এবং বিষয়বস্তুতে এবং সাধনায় স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। এখানে বাউল জীবন চর্যার অন্য নাম। এ অঞ্চলেই রবীন্দ্রনাথ 'খাঁটি বাউল' চিহ্নিত করেছিলেন। তার আলোচিত লালন-গগন-হাসন রাজা এ বদ্বীপের মানুষ।

পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র মধ্যখণ্ডে বেসরা সুফিদের জেকের, নাথ যুগীদের হঠযোগ, লৌকিক চারচন্দ্র ভেদ এবং যুগল সাধনার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ডিম-মাংস-মদ এখানে নিষিদ্ধ। মাছ বহু জন খান, উৎসবেও ব্যবহৃত হয় মাছ। লালন-দুদ্দু-পাঞ্জুর বিরোধিতা সত্ত্বেও গাঁজা খান অনেকে। রাঢ়ের বাউল গানে জাতবৈষ্ণব এবং দরবেশ-গোষ্ঠীর প্রাধান্য আছে। বিষ্ণুপুর ঘরানার বিলম্বিত লয়ের বড় তাল, ঝুমুর এবং আদিবাসী নাচ-গান ব্যবহার করেন গায়কেরা। সাধকেরা গেরুয়া, লাল রঙ-এর কাপড়, রুদ্রাক্ষ-পাথর-পুতির মালা, হাল-বেহাল-বিচিত্র আলখেল্লা এবং তুলসীমূলের হীরা ব্যবহার করে থাকেন। নাচ এ অঞ্চলের গানের অবিচ্ছেদ অংশ। খঞ্জনি, গুবায় আর নুপুর নাচে মঞ্চ কাঁপান বাউল শিল্পী। কণ্ঠে এবং বাদ্যে নিপুণ এ শিল্পীরা মুখ্যতঃ গায়ক, গৌনতঃ সাধক। খাদ্যে বা নেশায় এখানে বাছবিচার নেই। এরা অটলবিহারীর আনুগত্য মানে, কাপালিকদের বীরাচারকে আদর্শ জানে।

ভক্তি আন্দোলনে, লোকধর্মে গানের ভূমিকা যন্ত্রের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের সুফিরা মণ্ডলিতে সামা গান করতেন। দরবেশরা নাচতে নাচতে কেউ দশাপ্রাপ্ত হতেন। ভক্তি আন্দোলনে, লোকধর্মে তাদের ঐতিহ্য মিশে আছে। বাউল গানের গুরুবন্দনায়, প্রার্থনায়, আত্মনিবেদনে, জিকিরে মধ্যপ্রাচ্যের সুরের ভগ্নাংশ মিশে আছে। অনেকের মতে সারি-জারির রীতি পদ্ধতি ঝুমুর চটকার দ্রুত লয়ে মিশেছে। কিন্তু প্রবাহিত নদীর জলস্রোতে, নানা উৎসের জলকে আর পৃথক করা যায় না।

ভ্রাম্যমান বাউল ফকিরেরা মাধুকরী বৃত্তিতে নানা সুর, গানের নানা অঙ্গ সংগ্রহ করে তা গানের সঙ্গে মেশান। ইতিপূর্বে আমরা অমূল্য শাহ-র কথা বলেছি। নানা ধর্মীয় গান, যাত্রা-সিনেমা সঙ্গীতের সুর আত্তীকরণ করে নিজস্ব গীতরীতি নির্মাণ করেন পদকর্তা-গায়ক-গীতি প্রবর্তকেরা। হাল আমলে কাওয়ালি, গজল, বাদ্যহীন ইলমামি গানের বিচিত্র বিভঙ্গ দিয়ে ইসলামি ফকিরি গানের এক ঢং তৈরি করে, তাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। রাঢ়ের গায়কেরা ঝুমুর এবং সাঁওতালি সুরকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন বাউল গানে। দক্ষ বাদ্যকরেরা অযুত রকমের তাল ফেরতা বাজাচ্ছে। কেউ দোতারায় বাজাচ্ছেন সরোদ বা সেতারের ধ্রুপদী সুর। কেউ নাল-খোল-ঢোলে তুলছেন মাদল ও তবলার বোল। কেউ বাঁশিতে তুলছেন কোকিলের ডাক।

নদিয়ার মণি গোঁসাই সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের এক অনবদ্য গান লিখেছিলেন—

মদিনাতে এল মহম্মদ নদিয়াতে এল শ্যাম
ইমান খেলা খেলে রাসুল লীলা খেলে ঘনশ্যাম।[২০]

এ গানের প্রচলিত সুর, অবিকল লতা মঙ্গেশকরের রেকর্ডের গান, "তুমি মেরা মঞ্জিল, তুহি মেরা দেবতা"-র অনুরূপ। সৎ-সঙ্গের সঙ্গে যুক্ত একজন গায়ক এ গানটির পদকর্তার নাম গায়েব করে দিয়ে, নবির চার ইয়ারের সঙ্গে কৃষ্ণের ৪ সখার (যদিও সখা ১২ জন) মিলসূচক একটি কলি যুক্ত করেছেন।

কুবীর গোঁসাই-এর বিখ্যাত গান—"ডুবডুবডুব সাগরে সাগরে আমার মন" গানের সুরটি সম্ভবত নেওয়া হয়েছে ময়মনসিংহের নদী-দুর্ঘটনা বিষয়ক এক ছড়া "বাড়ি তার চন্ন পাড়ার চরে"-র সুর থেকে।[২১] রাঢ়ের জনৈক সুরকার কথাকার, "চম্পক বরণী ধনী" প্রভাতী গানের সুরে লিখেছিলেন—"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি", ক্ষুদিরামের ফাঁসির অনবদ্য গান। বাউল সুরে রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গের স্বদেশী গান লেখার কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন, "মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরি" গানটি থেকে একাধিক গান লিখেছিলেন—বাউল রচনাকারেরাও তেমনি একই সুর কাঠামো থেকে একাধিক গান রচনা করেন।

উনিশ-শতক থেকে বাউল গানের বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ ঘটছিল। কুবীর, কালাচাঁদ পাগল, হরিনাথ মজুমদার নীল বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, ঝড় নিয়ে নানা কবিতা রচেছেন। মুদ্রণ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যম, যোগাযোগের উন্নতি বহু বিচিত্র কথা ও সুরকে পৌঁছে দিচ্ছিল সঙ্গীতপ্রিয় বাউলদের কাছে। বিদেশী গানের ঢং, নাচ, জটার বিন্যাস বাউলেরা অনুসরণ করছিল। নানা প্রাদেশিক সুর, জনপ্রিয় যাত্রা-সিনেমা-ক্যাসেটের গান ছাপ ফেলছিল বাউল গানে। সুরের স্বাধীনতায় এগুলি আত্তীকরণে দ্বিধা ছিল না বাউল গায়কদের। বাংলা আঞ্চলিক গানের উচ্চারণ এবং সুর কাঠামো, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, দর্শকদের চাহিদা বাউল গানকে অধিকতর প্রভাবিত করছিল। ভিন্ন গীতরীতির স্পর্শে এ গানের সুর বদলে চতুর্মাত্রিক ঝুমুর আসামের চাবাগানে গিয়ে, বিহুর পাঁচ পর্দায় মিশে ভিন্নরূপ ধারণ করে। সময়ও বদলায় বাউল গানকে। ভবতোষ দত্ত বাল্যে ময়মনসিংহ শ্রীহট্টে যে সুরে হাসন রাজার গান শুনেছিলেন, প্রৌঢ়ে সে গানে সুরের ভিন্নতা চিহ্নিত করেন তিনি। দেশ-কাল-পাত্রের এ পরিবর্তন স্বীকার করে বাউলতত্ত্ব। নানা গীত রীতির ভগ্নাংশে, নাচ আত্মসাৎ করার মাধ্যমে বাউল গায়ক নিজস্ব গীত রীতিটি নির্মাণ করেছেন। হালে কেরলের বাসিন্দা এক মহিলা শিল্পী বিদেশীদের জট এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের নাচ তার গানে ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। এভাবেই লালনশাহী, মাইজভাণ্ডারী, আল-চিস্তি, রাধারমন, হাসন রাজা, বিজয়গীতি, ভবা পাগলার ঘরানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু নানা প্রভাবকে সাঙ্গীকৃত

সংগীতের ধ্যানে মন্দিরা বাজাচ্ছেন লালনপন্থী সাধিকা

করেও বাউল গান স্বরূপ হারায় না। বাউল অঙ্গকে ব্যবহার করেও রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা নজরুলগীতি যেমন তাদের স্বকীয়তা হারায় না; তেমনি বাউল গান কাওয়ালি, খেয়াল, ভাটিয়ালি বা রাগ সঙ্গীতে পরিণত হয় না। এই বিশিষ্ট রীতিটিকেই রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত 'বাউলসুর' বলে চিহ্নিত করেছেন।

বিষয়বস্তুতে বাউল গান সবিশেষ, স্বতন্ত্র। এ সমস্ত গান এক সুপ্রাচীন সাধনা এবং মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত। ভাববাদী-আচার-ধর্মের অনুমান অগ্রাহ্য করে, জাতি-বর্ণ-লিঙ্গভেদ অমান্য করে, শাস্ত্র-পুরোহিত মৌলবীদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে—এক প্রতিবাদের পতাকা বহন করে বাউল জনগোষ্ঠী। সাম্প্রদায়িক সীমানার বেড়া ভেঙ্গে এখানে হিন্দু-মুসলমান একাকার হয়ে যায়। এ সমস্ত মূল্যবোধ কোনো

বিশেষ ব্যক্তির বা অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অনুভব নয়। এ সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ে শ্রীহট্টের হাসন রাজার সঙ্গে রাঢ়ের পদ্মলোচনের পার্থক্য থাকে না। যে শাস্ত্র-ধর্মাচার-অনুশাসন মানুষের সহজাত স্বভাবকে পিষ্ট করে, যে সমস্ত সংস্কার এবং ব্যক্তিস্বার্থের অধিকার সমাজে বৈষম্য আনে—তার বিরুদ্ধে বাউল এক নয়া রাষ্ট্র গঠনের ডাক দেয়। এ দলে যোগ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ (*পত্রপুট* ১৫নং কবিতা দ্রষ্টব্য)। বাঙালি কীর্তনে এবং বাউল গানে মনের গোপন দ্বার খুলে দেয়। শব্দে সমর্পিত অতিজ্ঞানকে, ভাবকে এ গানে ফুটিয়ে তোলেন যথার্থ সাধক। এ গান সাধনার অঙ্গ, বাউলতত্ত্বের রসভাষ্য। এর ভাষিক পাঠ স্মৃতিতে, হস্তলিখিত খাতায় রক্ষিত হয়। কিন্তু গানের পরিবেশনায় থাকে গায়কের স্বাধীনতা। এ প্রবহমান ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। প্রচলিত লোকসাহিত্যে গ্রন্থস্বত্ব থাকে না। মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে, তবু মোটের উপর তা ঐক্যধারা নষ্ট হয় না।"[২২]

তথ্য নির্দেশ

১ সুধাংশু শেখর শাসমল, "বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ", সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, *রবীন্দ্র সঙ্গীতে বাউলভাবনা : বাণী ও সুর,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৫

২ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ,* ওরিয়েন্ট সংস্করণ, কলকাতা, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৯৫৮, পৃ. ১০০

৩ প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ৫ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৪১৪, পৃ. ২৫৮-২৬৩

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সঙ্গীতের মুক্তি", *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ১৪খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা পৃ. ৯০০

৫ সাইমন জাকারিয়া, *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক,* বাংলা একাডেমী, ২০০৭ এবং *কোকলোর ও লিখিত সাহিত্য: জারিগানের আসরে 'বিষাদ-সিন্ধু' আত্মীকরণ ও পরিবেশন পদ্ধতি* (নাজমীন মর্তুজার সাথে যৌথভাবে রচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

৬ Shawker Thaka, Chacha Song and Newar Buddhist : Ritaual Singing of Vajrayana Buddhism in Nepal

৭ সহজযান, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ,* ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৬২

৮ সুধীন দাশ, *লালনসঙ্গীত স্বরলিপি,* লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৬

৯ আজমত সা, বেহাল শাহ্-র প্রশিষ্য বীরেন দাস বাউল (নদিয়া)-এর তথ্য এবং ম. মনিরউজ্জামান *সাধক কবি লালন : কালে-উত্তরকালে,* পৃ. ৬৩-৮২ দ্রষ্টব্য।

১০ আশুতোষ ভট্টাচার্য, "বাংলা লোকগীতির সুরবিচার", *বাংলার লোকসাহিত্য,* ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৭, পৃ. ৫৯৩-৬১৩

১১ ওয়াকিল আহমদ, *বাউল গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০
১২ ওয়াকিল আহমদ, *লালনগীতি সমগ্র*, বইপত্র, ঢাকা বাংলাদেশ, ২০০২ দ্রষ্টব্য
১৩ পূর্বোক্ত
১৪ *লোকসঙ্গীত*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৫-২৮
১৫ শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসঙ্গীত : বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও রূপায়ন*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১৫,পৃ. ২৮-২৯
১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
১৭ আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাশ, *কবিতা সমগ্র*, অবসর, ঢাকা, ২০০৫
১৮ *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১৪খণ্ড, পৃ. ৯৯৮
১৯ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিদ্যাপতির পদাবলী*, বসুমতী সাহিত্য করপোরেশন, ১৩৯৬, পৃ. ১-৫
২০ বিস্তৃত গানটি আছে আমার, *বাউল-ফকির পদাবলি*, মন ফকিরা এবং অন্যান্য, কলকাতা, ২০
২১ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৩-৬১৩
২২ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, ওরিয়েন্ট সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ১০০

গ্রন্থপঞ্জি

১. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামণি*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৭
২. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৬৮
৩. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিদ্যাপতির পদাবলী*, বসুমতী করপোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৪২
৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, *অভ্র ও আবীর, কুহু ও কেকা*, কলকাতা, ১৯১৬, ১৯৬২
৫. ম. মনিরউজ্জামান, *সাধক-কবি লালন : কালে-উত্তরকালে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০
৬. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *লোকসঙ্গীত*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৯৯৬
৭. সনৎকুমার মিত্র, *বাউল লালন-রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, ১৯৯৫
৮. সুনীল দাস, *ভারতী, ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৪
৯. প্রশান্তকুমার পাল, *রবি-জীবনী*, ৫ম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ১৩৯৭
১০. জলধর সেন, *কাঙাল হরিনাথ*, ২খণ্ড, কলকাতা, ১৩২০-১৩২১
১১. ওয়াকিল আহমদ, *লালন গীতি সমগ্র*, বইপত্র, ঢাকা, ২০০২
১২. ওয়াকিল আহমদ, *বাউল গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০
১৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালনসমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৮
১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক সাহিত্য*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৭
১৫. শক্তিনাথ ঝা, *ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল এবং শিল্প*, সংবাদ, ২০০৭ (১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)
১৬. শক্তিনাথ ঝা, *বাউল-ফকির পদাবলী*, ১ম খণ্ড, মন ফকিরা ও অন্যান্য, কলকাতা, ২০০৯। ২য় খণ্ড, মন ফকিরা, কলকাতা, ২০১২
১৭. সুশান্ত সরকার, খুলনা, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০১০
১৮. সুধীন দাশ, *লালনসঙ্গীত স্বরলিপি*, লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৬

খণ্ড ১, সংখ্যা ১ ভাবনগর আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 BHABNAGAR August 2014

ভাঙিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস

কবি আলাওলের অনুবাদ-পদ্ধতি

থিবো দুবের

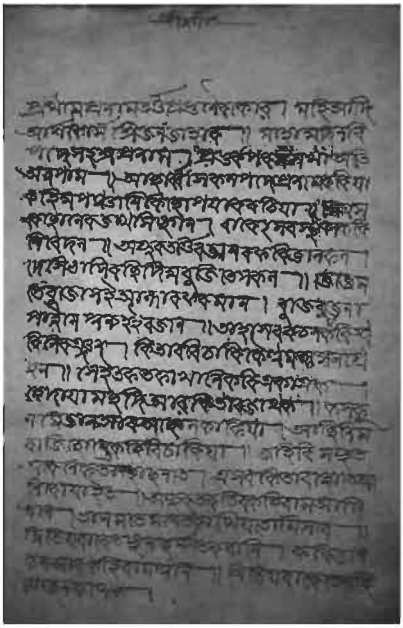

আলাওল-এর আখ্যানকাব্য ছয়ফলমুলুক-বদিউজ্জামাল
পাণ্ডুলিপির সূত্র: বা.এ.স.পু. নং : ১৬/আ১৬/সমু ৪

If one breaks it down, he will enjoy

The Poet Ālāol's Translation Technique

Thibaut d'Hubert

Abstract

The present article discusses how Ālāol, the famous poet of seventeenth-century Arakan, conceived of the task of translating Awadhi and Persian texts into the 'language of the payār meter', that is to say Bengali. After a brief introduction to the well known life and works of Ālāol, I highlight some features of the literary multilingualism prevalent during the poet's time in the kingdom of Arakan. Then, I proceed with an analysis of his discourse on 'translation' scrutinizing the terms and expressions he used to describe the process of textual transposition from one language to another. My comments attempt at providing a more detailed account of what is often called bhāvānuvāda by scholars of Bengali literature. What comes out of my observations is that Ālāol's dynamic approach to translation is grounded in reading practices evincing his familiarity with Sanskrit and Indo-Persian hermeneutic traditions. Translation implied an active intervention on the source text and, beyond the mere transmission of its meaning, further elaborations on its aesthetic content – all of which were conditioned by traditional textual hermeneutics. Finally, as an invitation to further reflection on the topic, I argue that this very specific approach to textual transposition was misunderstood and abandoned in modern times for the sake of different, and aesthetically less engaged, methods of translation.

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। একটি সাহিত্যিক ঐতিহ্য উপস্থাপন করার সময়ে আমরা প্রায় লক্ষ্য করি যে, কবি বা লেখকরা অন্য ভাষার প্রাচীনতর আদর্শ পাঠ অবলম্বনে নিজের ভাষায় কাব্য বা গদ্য রচনা করেন।[১]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইতে অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা পাওয়া যায়, কিন্তু অনুবাদ-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষকদের তেমন কোনো চিন্তাভাবনার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় না। নিশ্চয় কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও আছে। যেমন—সৈয়দ আলী আহসানের আলাওল ও জায়সীর *পদ্মাবতী*র তুলনামূলক আলোচনা, অথবা ফ্রান্সের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ফিলিপ বেনুয়ার সংস্কৃত আর বাংলা রামায়ণ সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ।[২] উল্লেখ্য, শেষোক্ত অভিসন্দর্ভটি অবশ্য ফরাসি ভাষায় লেখা।

আমি এখানে যে প্রশ্ন করতে চাই, তা হচ্ছে—অনুবাদ সম্বন্ধে প্রাক-আধুনিক সময়ে, অর্থাৎ ১৮ শতকের শেষ পাদের আগেকার কবিদের বক্তব্য কি ছিল? অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁরা কি কোনো বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে সচেতনভাবে মূলপাঠের হুবহু অর্থবহন করেছেন? তাঁদের রচনায় ভাবানুবাদ আর আক্ষরিক অনুবাদের বৈশিষ্ট্য কি রকম ছিল?

আমার গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে—১৭ শতকে আরাকান রাজ্য এবং রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, বিশেষত আলাওলের কাব্যসমূহ।[৩] আলাওল অত্যন্ত সচেতন কবি-অনুবাদক ছিলেন বলে প্রাক-আধুনিক বাংলা অনুবাদতত্ত্ব জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর রচনাবলী বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক বিবেচনা করি।

প্রথমে আরাকানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিচয় দেব। তারপরে বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ ইতিহাসজ্ঞ দ্বারা পূর্বে আলোচিত আলাওলের জীবন ও রচনার ভূমিকা দিয়ে অনুবাদ সম্বন্ধে কবির নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বিশ্লেষণ করবো।

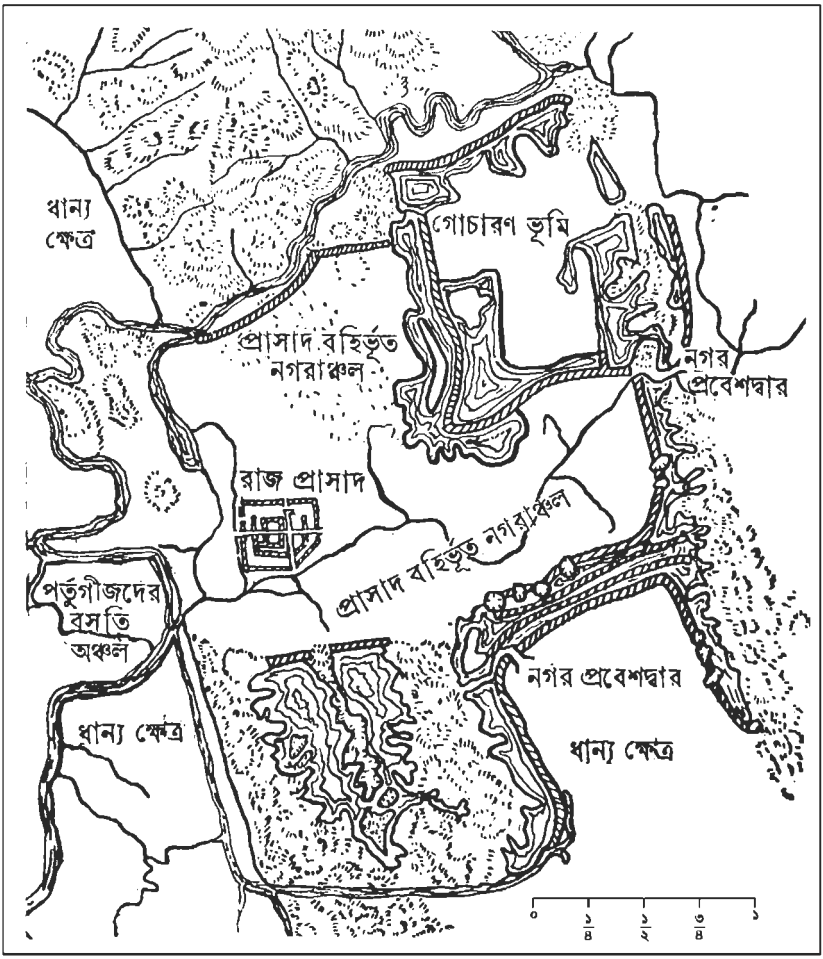

মানচিত্রে ম্রৌক-উ রোসাঙ্গ শহর, (চিত্রের উৎস: পদ্মাবতী, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত)

আরাকান রাজ্য ও বাংলা সাহিত্য

ষোল শতকের শেষার্ধে আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল।[৪] তখনকার রাজধানী ছিল ম্রৌক-উ[৫] এবং থেরাবাদ-বৌদ্ধ রাজাদের শাসনের ব্যাপ্তি উত্তরপশ্চিমে চট্টগ্রাম আর দক্ষিণপূর্বে বেসিন পর্যন্ত।[৬] রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরাকান ছিল বহির্মুখী ও বিশ্বজনীন।[৭] বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন বন্দর-শহরের মতো ম্রৌক-উতে বাণিজ্য ছিল স্থানীয় মুসলিমদের হাতে এবং তাঁরা প্রায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক যোগাযোগে নিযুক্ত ছিলেন। ফলে তাঁরা খুব সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং বৌদ্ধরাজাদের অধীনে আঞ্চলিক উচ্চ শ্রেণীতে পরিণত

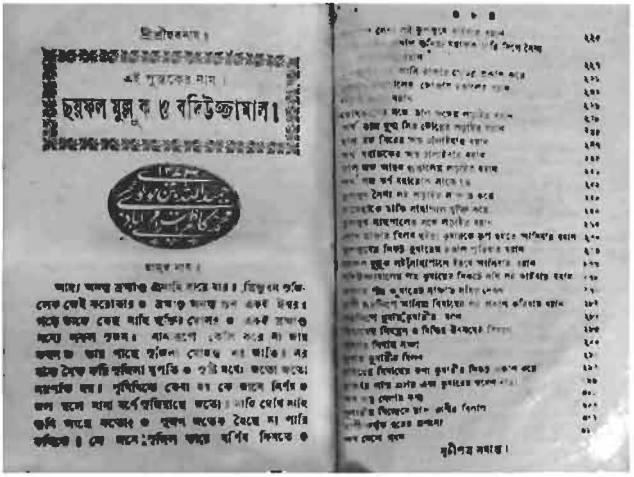

ছয়ফলমুলুক-বদিউজ্জামাল *কাব্যের মুদ্রিত পুথির আলোকচিত্র*
(সূত্র : বাংলা একাডেমী মু.পু./৩৪০)

হয়েছিলেন।[৮] এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ঘটেছিল। ষোল শতকের চট্টগ্রামের সুফি লেখক সৈয়দ সুলতান আরাকান রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। সুতরাং আরাকান রাজ্য মুসলিম বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তির স্থান বললে অসঙ্গত হবে না।[৯] সংক্ষেপে বলবো যে, আরাকানে বাংলা সাহিত্যের দুটো কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম আর ম্রৌক-উ।[১০]

চট্টগ্রামের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বিষয় ছিল গ্রামবাসীদের কাছে ইসলাম ধর্মের প্রচার।[১১] এ ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* এবং তাঁর মুরিদদের রচনাবলী এ ধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১২]

রাজধানী ম্রৌক-উতে যে বাংলা সাহিত্যের নমুনা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এসেছে, ওটা চট্টগ্রামের সাহিত্যের থেকে পৃথক। এই পার্থক্যটা হচ্ছে রাজধানীর কবিরা সভাকবি ছিলেন এবং তাঁদের রচনায় সভাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপস্থিত; যেমন—রাজা, রাজ্য ও পৃষ্ঠপোষকের দীর্ঘ প্রশংসা এবং কবি ও সভাসদদের পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের প্রশংসা করা। এই শহরের সাহিত্যেও লেখকদের উপরে সুফিবাদের প্রভাব বিদ্যমান, কিন্তু চট্টগ্রামের দেশি ফকিরিধারার বিপরীতে তাঁরা বিশিষ্ট সুফি সম্প্রদায়, যেমন—চিশতিয়া ও কাদিরিয়া তরিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সভাকবি হিসেবে তাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবান্বিত রূপক প্রেমকাহিনী লিখেছেন। চট্টগ্রাম লেখকদের মতো তাঁদের উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্মের প্রচার ছিল না। তবে অনুবাদকর্মের মাধ্যেমে রাজধানীবাসী সমৃদ্ধ বাঙালি মুসলিমদের সংস্কৃতি ও আদব সংস্কার করা তাঁদের পরিকল্পনা ছিল।

আলাওল প্রসঙ্গ

আলাওল রোসাঙ্গের সাহিত্যমণ্ডলের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। আধুনিক কালে প্রাপ্ত হাতে-লেখা পুথি আর বটতলায় সম্পাদিত বইয়ের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, আলাওল পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ, একটি নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ, আর কয়েকটি পদাবলী রচনা করেছেন।[১৩] উনি প্রথমে 'আওয়াধী'[১৪] আর পরবর্তীকালে 'ফার্সি' ভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলেন।[১৫] মাঝেমধ্যে তাঁর অনূদিত কাব্যে মৌলিক উপাখ্যানও সংযুক্ত হয়েছে।

আলাওল মূলত ফতেহাবাদ রাজ্যের—আধুনিক ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তখনকার স্থানীয় অধিপতির মন্ত্রীর পুত্র ছিলেন। একদিন কোনো কাজের উদ্দেশ্যে তাঁর বাবার সঙ্গে নৌকায় ভ্রমণ করার সময় রোসাঙ্গের ফিরিঙ্গিরা তাঁদের আক্রমণ করে এবং আলাওলের পিতা ফিরিঙ্গিদের হাতে হত্যার শিকার হন। আর আলাওল নিজে বন্দী অবস্থায় রোসাঙ্গে পৌঁছে রাজ-অশ্বারোহী হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু আলাওল যে শুধু অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিলেন, তা নয়, তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যও প্রদর্শন করতেন। এ কারণে রোসাঙ্গের মুসলিমেরা তাঁকে বৌদ্ধ রাজের মুসলিম মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের সভায় নিয়ে যান। মাগনের সভাসদ্ হয়ে **১৬৫১** সালের দিকে আলাওল তাঁর আদেশে মুহম্মদ জায়সীর 'আওয়াধী' ভাষায় রচিত

পদ্মাবতী

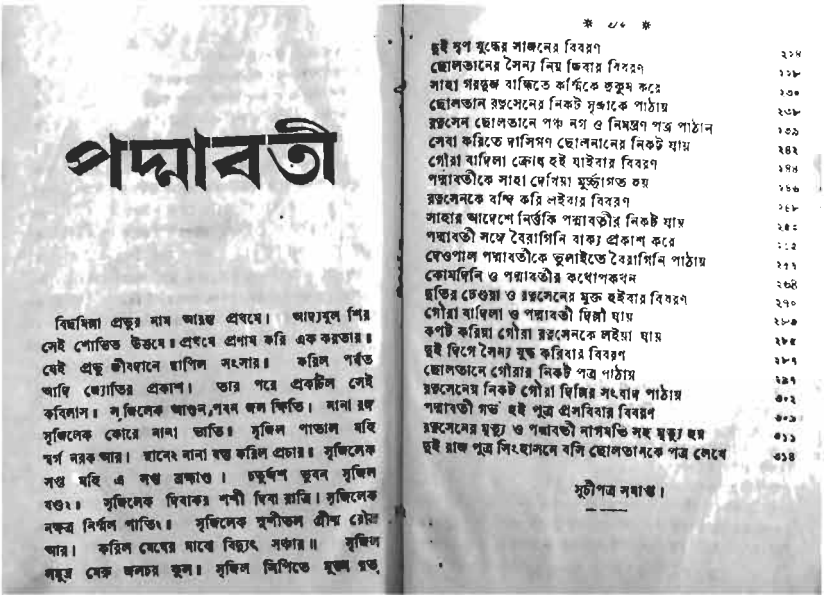

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথমে। আদ্যমূল শির সেই শোভিত উত্তমে। প্রথমে প্রণাম করি এক করতার। যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার। করিল পর্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ। তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস। সৃজিলেক আগুন, পবন জল ক্ষিতি। নানা রঙ্গ সৃজিলেক কোরে নানা ভাতি। সৃজিল পাতাল মহি স্বর্গ নরক আর। স্থানেং নানা বস্তু করিল প্রচার। সৃজিলেক সপ্ত মহি এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড। চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ডং। সৃজিলেক দিবাকর শশী দিবা রাত্রি। সৃজিলেক নক্ষত্র নির্ম্মল পাতিং। সৃজিলেক সুশীতল গ্রীষ্ম রৌদ্র আর। করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার॥ সৃজিল সমুদ্র মেরু জলচর কুল। সৃজিল সিপিতে মুক্তা মত,

* ৮৮ *

দুই নৃপ যুদ্ধের সাজনের বিবরণ	২২৪
ছোলতানের সৈন্য নিয় ফিরার বিবরণ	২২৮
সাহা গরস্তুক বাঙ্গিতে কাৰ্ম্মিকে হুকুম করে	২৩০
ছোলতান রত্নসেনের নিকট সৃজাকে পাঠায়	২৩৮
রত্নসেন ছোলতানে পঞ্চ নগ ও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান	২৩৯
সেবা করিতে দাসিগণ ছোলতানের নিকট যায়	২৪২
গোরা বাদিলা ক্রোধ হই যাইবার বিবরণ	২৪৪
পদ্মাবতীকে সাহা দেখিয়া মুর্চ্ছাগত হয়	২৬৬
রত্নসেনকে বন্দি করি লইবার বিবরণ	২৫৮
সাহার আদেশে নির্ত্তকি পদ্মাবতীর নিকট যায়	২৬০
পদ্মাবতী সঙ্গে বৈরাগিনি বাক্য প্রকাশ করে	২৬২
দেওপাল পদ্মাবতীকে ভুলাইতে বৈরাগিনি পাঠায়	২৬৬
কোমদিনি ও পদ্মাবতীর কথোপকথন	২৬৪
ছুত্তির চেঙুয়া ও রত্নসেনের মুক্ত হইবার বিবরণ	২৭০
গোরা বাদিলা ও পদ্মাবতী দিল্লী যায়	২৮০
কপট করিয়া গোরা রত্নসেনকে লইয়া যায়	২৮৫
দুই দিগে সৈন্য যুদ্ধ করিবার বিবরণ	২৮৭
ছোলতানে গোরার নিকট পত্র পাঠায়	২৯৭
রত্নসেনের নিকট গোরা দিজির সংবাদ পাঠায়	৩০২
পদ্মাবতী গর্ভে দুই পুত্র প্রসবিবার বিবরণ	৩০৩
রত্নসেনের মৃত্যু ও পদ্মাবতী নাগমতি সহ মৃত্যু হয়	৩১১
দুই রাজ পুত্র সিংহাসনে বসি ছোলতানকে পত্র লেখে	৩১৪

সূচীপত্র সমাপ্ত।

আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্যের মুদ্রিত পাণ্ডুলিপির ১ম পৃষ্ঠা
(সূত্র: বাংলাএকাডেমী মু.পু./৩৪৩)

সুফি প্রেমকাহিনী *পদুমাবৎ* দেশিভাষায়, অর্থাৎ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাজমন্ত্রীর অনুরোধে আলাওল অন্য পাঁচখানা কাব্যগ্রন্থ লেখেন। উল্লেখ্য যে, ১৬৬০ সালে মুঘল শাহজাদা সুজা রোসাঙ্গে পলায়ন করার পরে আলাওল আওয়াধী ভাষা ছেড়ে কেবল ফার্সি ভাষা থেকে অনুবাদ করেন। এই রাজনৈতিক বিভ্রাটের কারণে স্থানীয় আরাকানি প্রশাসন দেশি আর বিদেশি মুসলিমদের প্রতি সন্দিহান হতে লাগল, সুতরাং পূর্বের সামাজিক ও ধর্মীয় ভারসাম্যের ক্ষতি হয়েছিল।

আলাওলের সাহিত্যচর্চায় ফার্সি ভাষার প্রাধান্য দেয়ার ঘটনাটি স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণ থেকে বাঙালি মুসলিমদের তফাতে থাকার চেষ্টা বলে বিবেচনা করা অযৌক্তিক হবে না। আলাওল তাঁর শেষের কাব্য ১৬৭১ সালে মজলিস নবরাজের আদেশে রচনা করেছিলেন। কাব্যটা ছিল বারো শতকের ফার্সি কবি নিজামী গঞ্জবীর *সিকান্দারনামা*-র বঙ্গানুবাদ।

রোসাঙ্গের সাহিত্যিক সভামণ্ডল ও অনুবাদকর্ম

আলাওলের অনুবাদপদ্ধতি সঠিকভাবে বোঝবার জন্য, তখনকার সামাজিক পরিবেশ ও আসরে পাঁচালি কাব্য সাধনার রীতি নির্ণয় করা দরকার। আলাওল নিজের কাব্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই বর্ণনা থেকে দেখতে পাই যে, রোসাঙ্গের সভার রূপের সঙ্গে ফার্সি মজলিস-এর অনেক মিল ছিল। ফার্সি মজলিসের একটা বৈশিষ্ট্য হলো—কাব্যে বচন বা সুখন-এর প্রধানতা। নিজামী তাঁর বিভিন্ন *মসনবীতে* বচনের প্রশংসা রচনা করেছেন। যদিও *মসনবী* বর্ণনামূলক ধরণের কাব্য, প্লট আর বর্ণনার পাশে শ্রোতারা প্রতি পংক্তির শব্দগুলোর বিশেষ ব্যবহার এবং অর্থ আর শব্দ অলংকারের নিপুণ প্রয়োগের মূল্যায়ন ও উপভোগ করতে সক্ষম হতেন। সুতরাং কাব্য সুদীর্ঘ হলেও তার কাব্যিক ঘনত্ব (poetic density) কোনো প্রকারে উপেক্ষিত হয় নি। উপমহাদেশে *মসনবী* বর্ণনামূলক কাব্যের অর্থগ্রহণ প্রক্রিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পাই ফার্সি ভাষায় রচিত অসংখ্য হাশিয়া বা মূলপাঠের প্রান্তে লেখা বৈচিত্র্যময় টীকা সমূহে।[১৬] নিঃসন্দেহে আলাওল নিজে এ ধরনের হাশিয়াযুক্ত *সিকান্দারনামা, হপ্ত পয়কর* ও *তোহফা* তাঁর উস্তাদের কাছে পড়েছিলেন। ফলে আলাওলের কাব্যে *পাঁচালি* নাট্যগীতির রীতির অতিরিক্ত ছিল কবিত্বের বিষয়ে তর্ক ও বিবেচনা। আলাওলের কাব্যে কাহিনীর প্রসঙ্গের চেয়ে কবির দক্ষতা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের ব্যাপ্তিকে আরো গুরুত্ব দেয়া হলো। সভাসদেরা ছিলেন বহুভাষাবিদ এবং তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, হিন্দুস্তানি, বাংলা ও মগ আরাকানের স্থানীয় ভাষা।

অন্য একটা উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে যে, চট্টগ্রাম এলাকার সমসাময়িক কবিদের মতো সভাকবি আলাওল বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করা অবৈধ ও খোদার কাছে ক্ষমার

ফার্সি কবি নিজামী গঞ্জবীর সিকান্দারনামা
(সূত্র: ইন্টারনেট)

আলাওলের সিকান্দারনামা *কাব্যের পাণ্ডুলিপি*
(সূত্র: বাএ)

প্রার্থনাযোগ্য ব্যাপার বলে মনে করেন নি।[১৭] তবুও সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতের বিরুদ্ধে আমি বলবো—আলাওলের কাব্যগুলো সেক্যুলার নয়, বরং ধর্মভিত্তিক।[১৮] কিন্তু পূর্ববর্তী আর সমকালীন হিন্দু ও মুসলিম বাংলা কবিদের চেয়ে তাঁর সামাজিক পরিবেশ ও সৌন্দর্যতত্ত্বের ধারণা আলাদা ছিল। বহির্মুখী আরাকান রাজ্যের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সাহিত্যে দেশি ভাষার ব্যবহার তাদের পরিচয়-পরিচিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাছাড়া আমরা দেখব, আলাওলের মতে দেশি ভাষার মাধ্যমেই ভিন্ন ভাষায় রচিত পাঠের সাহিত্যিক রস পূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব। কবিত্বের বিষয়ে আলাওলের বক্তব্য পড়ে মনে হয়, ভাষাগুলোর মধ্যে মান-মর্যাদার কোনো ব্যবধানের প্রশ্ন ছিল না। সংস্কৃত, ফার্সি বা বাংলা কবিরা সবাই একই কাব্যনিধি থেকে সাহিত্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করার ক্ষমতা উপার্জন করেছেন। তিনি বলেন,

> কবি শক্তি বিধাতার রত্নের ভাণ্ডার।
> সকলেরে সমান না দিছে করতার ॥

অন্যত্র বলেন যে, উপরোক্ত কাব্যের ভাণ্ডারের দুটো বৈশিষ্ট্য থাকে:

১. প্রথমে যদিও পূর্বকালের কবিরা এ ভাণ্ডার থেকে প্রচুর রত্ন অর্থাৎ রসযুক্ত কাব্য সংগ্রহ করেছেন, তবুও তার অলৌকিক স্বরূপের কারণে এ সাহিত্যভাণ্ডার

একেবারে কমে যায় নি। এ সম্পর্কে আলাওল *পদ্মাবতী*-তে বলেন[১৯]:

কাব্যরত্ন লুটিল যথেক অগ্রগামী।
পৃষ্ঠগামী হৈয়া তথা কি পাইব আমি ॥
তবে সে প্রভুর ভাণ্ডার নহে উন।
যত টুটে তত বাড়ে এই মহাগুণ ॥

২. দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—প্রতিভার ভাণ্ডার কবির হৃদয়ে থাকে। আবার লক্ষ্য করা যায়—কবিত্ব একটা আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার ফল। এ নিয়ে স্মর্তব্য যে, সুফিবাদে হৃদয়ের উপরে ধ্যান ঈশ্বরের স্বরূপ পাওয়ার পরম পদ্ধতি।[২০]

আসলে আলাওল প্রতিভার ক্রিয়ার ব্যাখ্যা তখনকার সংস্কৃত ও ফার্সি সাহিত্যিক ঐতিহ্য অবলম্বনে রেখে তৈরি করেছেন। সংক্ষেপে বলতে পারি, আলাওলের ব্যুৎপত্তির ভিত্তি সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, ফার্সি মসনবীর ভূমিকার শিক্ষা ও উপদেশমূলক মন্তব্য এবং উপরিউক্ত ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যা।[২১]

সাহিত্যিক অনুবাদের ক্ষেত্রে কবির এমন উপদেশমূলক মন্তব্য অতি মূল্যবান। তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন, সব কবির প্রতিভার উৎস এক এবং অনুবাদ করার সময়ও এই প্রতিভা দরকার। সুতরাং, আধুনিক অনুবাদতত্ত্বের পরিভাষায়, আলাওলের অনুবাদ *ক্রিয়াশীল* বা *ডাইনামিক* বলা যেতে পারে।

একদিকে গবেষকরা যাঁরা লিখেছেন যে, তাঁর কাব্যগুলো প্রধানত ভাবানুবাদ তাঁরা অনুবাদের ক্রিয়াশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে এমন বক্তব্য করেছেন। কিন্তু ভাবানুবাদ বললে কবির রচনার বৈচিত্র্য বোঝা যায় না বলে মনে করি।

এখন আমরা দেখবো—আলাওল কিভাবে অনুবাদের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এ থেকে অনুবাদক হিসেবে তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল, তা নির্ণয় করতে চেষ্টা করবো। আমরা দেখবো অনুবাদের চর্চার মধ্যদিয়ে আলাওল সাহিত্যতত্ত্ব আর বহুভাষিক কাব্যাঙ্গনে দেশি কবির স্থান সম্বন্ধে সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন।

অনুবাদপদ্ধতি—অর্থ বহন করা ও ক্রিয়াশীল অনুবাদ

আমরা আগে বলেছি, কাব্য রচনা আর অনুবাদকর্ম নিয়ে আলাওল অনেক মন্তব্য করেছেন। আলাওলের কথায় অনুবাদের তিনটে স্তর আছে—

১. ভিন্ন ভাষায় মূলপাঠের অর্থ বোঝা

২. রস নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে মূলকাব্যের রূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা

৩. নির্ণিত রস পুনরায় বহন করার জন্য বাংলা ভাষায় নতুন সাহিত্য ভাজন, অর্থাৎ পাঁচালি কাব্য রচনা করা—যাতে সভাসদরা পূর্ণভাবে রস উপভোগ করতে পারে।

আলাওলের এ অনুবাদক্রিয়াটি বিভিন্ন উপলক্ষে স্পষ্টভাবে তাঁর পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে বুঝিয়েছেন, যেমন—ফার্সি ভাষা থেকে অনূদিত *সপ্ত পয়কর* ও

সিকান্দারনামা কাব্যের ভূমিকায় যথাক্রমে তিনি জানিয়েছেন[২২]—

১
তবে মোরে আদেশিল হাসিতে হাসিতে।
যত্ন করি এই কথা পয়ারে রচিতে ॥
পারশ্য আরবি ভাষে বএআত[২৩] ছন্দ।
বিশেষ নিজামী বাক্য সদগুণ[২৪] প্রবন্ধ ॥
এই গ্রন্থ মাঝে আর যত ইতিহাস।
পয়ার প্রবন্ধে তাকে করহ প্রকাশ ॥

২
নিজামী ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ।
ভাঙিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস ॥

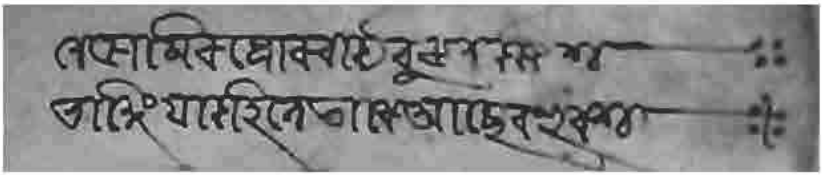

আলাওল রচিত সিকান্দারনামা কাব্যে অনুবাদ সম্পর্কিত কথার লিপিকারকৃত হস্তলিপি
(এখানে একটি পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: 'তাহে'-এর পরিবর্তে এখানে 'তারে' লিপিবদ্ধ হয়েছে)

প্রথম উদ্ধৃতিতে পৃষ্ঠপোষকের আদেশের বাক্য বিন্যাস লক্ষণীয়। প্রথমে যে কাহিনী আলাওল আদেশকারীর কাছে বলেছেন, ওটা একটা *পয়ার প্রবন্ধে*, অর্থাৎ পয়ার ছন্দে রচিত বাংলা পাঁচালিতে তিনি নতুন করে কাব্য সৃষ্টি করবেন। তারপর তিনি বলেন—ফার্সি ও আরবি ভাষার ছন্দের নাম *বয়েত* এবং কবি নিজামী ফার্সি কবিদের মধ্যে দক্ষ ও প্রতিভাবান। উল্লেখযোগ্য যে আলাওল অল্প কয়েকটি পংক্তির মধ্যে দুইবার কাব্য বলতে *প্রবন্ধ* শব্দ ব্যবহার করেছেন। সংগীত ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে *প্রবন্ধ* শব্দের অনেক অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু *প্রবন্ধের* আসল অর্থ হচ্ছে—যেটা একসাথে বাঁধা হয়েছিল। সুতরাং বাংলা ভাষার কবি আলাওল এখানে সম্ভবত আরবি-ফার্সি *নযম* শব্দ অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। *নযম* মানে হারের মুক্তাশ্রেণীর মতো কাব্যের পংক্তিগুলো একসাথে গাঁথা।[২৫] অন্যত্র আলাওল কবিত্বের উপাদানের তালিকা করে সর্ব-অর্থ-গাঁথনি উল্লেখ করেন।[২৬] এই পারিভাষিক শব্দ তখনকার *প্রবন্ধ* রচনার প্রক্রিয়ার ধারণা আরো স্পষ্টভাবে বোঝায়। লক্ষ করার বিষয় যে, আলাওলের এই সাহিত্যিক পরিভাষার মধ্যে অনুবাদকর্মের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয় উদাহরণে সংক্ষিপ্তভাবে আলাওল তাঁর অনুবাদতত্ত্বের সারাংশ প্রদর্শন করেন। অনুবাদের তিনটে ক্রিয়া উল্লেখ করেন।

১. বুঝন—অর্থাৎ মূল পাঠের ভাষার বাচ্যার্থ বোঝা

২. ভাঙন—অর্থাৎ বাচ্যার্থ থেকে কাব্যের আন্তরিক ভাব ব্যাখ্যা করা

৩. কহন—এই সাহিত্যিক ভাব অনুভব করে পাঠক বা দেশি শ্রোতাদের সন্তোষের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় পাঁচালি রচনা করা।

আলাওলের মতে, সাহিত্যিক অনুবাদ করতে গিয়ে কবি-অনুবাদককে দুটো প্রধান তথ্যের উপরে নজর রাখা আবশ্যক। মূলপাঠের রূপ, বিশেষত ছন্দ আর রসের নির্ণয়। কাব্যের বাহ্যিক রূপ সম্বন্ধে তিনি বেশির ভাগ সময় *বাংলা ভাষা* শব্দটি ব্যবহার করেন না, বরং তিনি *পয়ার প্রবন্ধ* বলেন। তাঁর কাছে অনুবাদকর্ম শুধু একটা ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় কাব্য রচনা করার ব্যাপার নয়, আসলে বিদেশি সাহিত্যক রূপের ভাবটাকে দেশি পাঁচালির মাধ্যমে রূপান্তর করা। এই সূক্ষ্ম অনুবাদসাহিত্য-তত্ত্বের ফলে বাংলা ভাষা ও ফার্সি ভাষার কাব্যের সৌন্দর্য বহনের ক্ষমতা সমান বলে বিবেচনা করা যায়। অনুবাদ করতে গিয়ে নিজেকে একটা কবির পরম্পরার মধ্যে স্থান দেয়া আলাওলের ইচ্ছা ছিল। আলাওলের কাব্য বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অনুবাদ শব্দটা যথার্থ। অনুবাদ মানে—যে বচন অন্য কারো বচনের পরে আসে, আর সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের অর্থ—ঠিক ভাষান্তর নয়, দৃষ্টান্তমূলক ব্যাখ্যা।[২৭]

আলাওল শুধু ভাষান্তর করেন, একই সাথে তিনি পূর্ববর্তী কবিদের বচন বিস্তার করতেও প্রয়াসী ছিলেন। তিনি তাঁর এই ধারণাটি জায়সীর কথার অনুসারে *পদ্মাবতী* কাব্যে প্রকাশ করেন।

অবধী কবি জায়সী বলেন[২৮] —

কবি বিআস রস কঁবলা পূরী। দূরহি নিঅর নিঅর ভা দূরী।
নিঅরহি দূরি ফূল সঁগ কাঁটা। দূরি জো নিঅরৈঁ জস গুর চাঁটা।
ভঁবর আই বনখণ্ড হুতি লেহিঁ কঁবল কে বাস।
দাদুর বাস ন পাবহিঁ ভলেহিঁ জে আছহিঁ পাস ॥২৪॥[২৯]

আলাওল অনুবাদ করেন[৩০] —

কাব্যকথা কমল সুগন্ধি ভরিপূর।
দূরেত নিকট ভাব নিকটেত দূর ॥
নিকটেত দূর যেন পুষ্পেত কণ্টিকা।
দূরেত নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা ॥
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেত বশ।
নিকটে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস ॥
এহি সূত্রে কবি মহম্মদ করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি ॥

দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে নিজ কক্ষে গবেষণারত আলাওল-সাহিত্যবিশেষজ্ঞ থিবো দুবের

যদিও আলাওল ভাবানুবাদ ও নিজের সৃজনশীলতার কারণ পাঠকদের বোঝাতে চান, তবুও জায়সীর কথা আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করেছেন। তার মানে হচ্ছে—ভাবানুবাদ হলেও আক্ষরিক অনুবাদ অনুপস্থিত নয়। আসলে, আলাওলের কাব্যে আক্ষরিক অনুবাদ ভাবানুবাদের ভিত্তি। এই উদাহরণে দেখি—অনুবাদক হিসেবে আলাওল শুধু শেষের চরণ দুটো সংযোজন করেছেন। সংক্ষেপে জায়সীর মন্তব্য রসজ্ঞতা সম্বন্ধে। আওয়াধী কবি বলেন—মূর্খ পাঠক যদি কাব্য পড়ার পরও কিছু না বোঝে, সাহিত্যিক রস পাবে না, কেবল বিদগ্ধ সহৃদয়ই রসটা উপলব্ধি করবে। আলাওলের অতিরিক্ত পংক্তি থেকে বোঝা যায় যে, অনুবাদক হওয়ার জন্য বিদগ্ধ সহৃদয় হওয়া দরকার, তাহলে মূলপাঠের সূক্ষ্ম অর্থের অভিজ্ঞতা থেকে অনুবাদকের নিজের সৃজনশীলতা মুক্তভাবে বিকশিত হয়। এ কারণে আমরা বলতে পারি—আলাওলের অনুবাদপদ্ধতি ব্যাখ্যাত্মক; অনূদিত কাব্যে মূলপাঠের ভাব সঠিকভাবে বহন না করলে নিজের মনের উক্তি প্রকাশ করা অনুচিত। এই কারণে, আলাওল বলেন *স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি*, অর্থাৎ সুযোগ পেলে বা দরকার হলে মূলপাঠ থেকে সরে গিয়ে নিজের মনের কথা প্রকাশ করবো। সুতরাং আক্ষরিক অনুবাদের পাশে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও উপাখ্যানের সংযোজন থাকে। এ দুটো ব্যাখ্যাত্মক উপকরণ মূলপাঠের অর্থ উদ্দীপনের জন্য কবি-অনুবাদক সংযোগ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোল ও সতেরো শতাব্দী হলো সচেতনতার যুগ। আমরা দেখি, তখন বিশেষত বৈষ্ণব আর মুসলিম লেখকরা কোনো কোনো পাঠে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিজস্ব মন্তব্য দিতে শুরু করেন। এর আগে পাঁচালির গায়েন আর কবির মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। আসলে, কবি ছিল একরকম আদি গায়েন এবং সে ছিল প্রায় নামহীন।[৩১] লেখক হিসেবে কোনো বক্তব্য দেয়ার

দরকার ছিল না, কারণ আসরে কাব্যের পরিবেশনই সাহিত্যের পরম উদ্দেশ্য ছিল। এই সাধনাকেন্দ্রিক সাহিত্য ষোল শতকের পরে আজ পর্যন্ত কিচ্ছাগান (পালাগান) ও জারিগানের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে, কিন্তু পাশাপাশি অন্য সাহিত্যচর্চার ধারা উৎপন্ন হয়েছে। সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের ফলে এবং অন্য ভাষার সাহিত্যের প্রভাবে আলাওলের মতো কোনো কোনো কবির চেতনার মধ্যে প্রবল বিবর্তন ঘটেছিল। কবি নিজের অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, যাতে পাঠক সঠিকভাবে কাব্যের রচনাশৈলী মূল্যায়ন করতে পারে। যে তথ্য তার রচনা সম্বন্ধে কবি নিজে দিয়েছেন, তা আধুনিক গবেষক ও পাঠকদের কাছেও অতি মূল্যবান।

এভাবে প্রাচীন সাহিত্য যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। না হলে আমরা কেবল আমাদের আধুনিক চিন্তাভাবনা অতীতের ওপর আরোপ করতে থাকব। আলাওল সতেরো শতাব্দীর একটি বিশেষ ব্যাখ্যাত্মক অনুবাদের প্রবণতার প্রতিনিধি– পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণনাকেন্দ্রিক অনুবাদের পরে এবং ঔপনিবেশিক কালের অনুবাদরীতির আগে, যখন মিশনারি আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তাগিদে ব্যাখ্যাত্মক অনুবাদকে আর মূল্য দেওয়া হয় নি। এই প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ ধরণের সৃজনশীল সহৃদয়তার বিকাশ আজ বিলুপ্তি দেখতে পাই।

তথ্যনির্দেশ

১ এ ক্ষেত্রে সতেরো শতেকের ফরাসি ধ্রুপদী সাহিত্যিক রুচির ক্রমবিকাশে অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি আগ্রহোদ্দীপক গবেষণামূলক বই দ্রষ্টব্য - Roger Zuber, Les *"belles infidèles" et la formation du goût classique. Perrot d'Ablancourt et Guez de Balzac.* (Paris: A. Colin, 1968). এ বই নিয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রঃ Carlo François, The French Review 42, no. 5 (April 1, 1969): 777–778. বলা বাহুল্য, ১৭ শতকের ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমকালীন বাংলাদেশের পরিবেশের থেকে আলাদা ছিল, কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের সমীক্ষার প্রণালীর ক্ষেত্রে জুবের-এর আলোচনা আজ পর্যন্ত আদর্শনীয়।

২ Philippe Benoît, "Le Rāmāyṇa de (x2) Vālmīki et le Rāmāyṇa de Kṛttibas. Recherches comparatives en littératures sanskrite et bengalie" (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, 1994).

৩ Thibaut d'Hubert and Jacques P. Leider, "Traderts and Poets in Mrauk-U: On Commerce and Cultural Links in Seventeenth Century Arakan," in Pelagic Passageways: Dynamic Flows in the Northern Bay of Bengal World Before the Appearance of Nation States, ed. Rila Mukherjee (New Delhi: Primus Books, 2011), 345–379; Thibaut d'Hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siécle à Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan" (École Pratique des Hautes Études, 2010); d'Hubert, Thibaut and Womser, Paul, "Représentations du monde dans le Golfe du Bengale au XVIIe siècle: Ālāol et Rānīrī ," *Archipel* 76 (2008): 15–35.

[৪] D'hubert and Leider, "Traders and Poets in Mrauk-U: On Commerce and Cultural Links in Seventeenth Century Arakan,"; Stephan Van Galen, "Arakan and Bengal, the Rise and Decline of the Mrauk-U Kingdom (Burma) from the Fifteenth to the Seventeenth Century A.D." (Leiden University, 2008); Michael W. Charney, "Where Jambudipa and Islamdom Converged: Religious Changes and the Emergence of Buddhist Communalism in Early Modern Arakan, 15th-19th Centuries" (University of Michigan, 1999).

[৫] বাংলায় রোসাঙ্গ নামে পরিচিত।

[৬] Jacques Leider, "On Arakanese Territorial Expansion: Origin, Context, Means and Practice," *in The Maritime Frontier of Burma : Exploring Political, Cultural, and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800,* ed. Jos Gommans and Jacques P. Leider (Amsterdam; Leiden: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; KITLV Press, 2002), 127–150.

[৭] Sanjay Subrahmanyam, "And a River Runs through it: The Mrauk-U Kingdom and its Bay of Bengal Context," in *The Maritime Frontier of Burma : Exploring Political, Cultural, and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800,* ed. Jacques P. Leider and Jos Gommans (Amsterdam ; Leiden: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; KITLV Press, 2002), 107–126; d'Hubert and Leider, "Traders and Poets in Mrauk-U: On Commerce and Cultural Links in Seventeenth Century Arakan."

[৮] d'Hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siécle à Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan," 99–127.

[৯] মুহম্মদ সগীরের কাল নির্ণয়ের বিবাদে, আমার মতে, অধ্যাপিকা রাজিয়া সুলতানা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যদি মুহম্মদ সগীর প্রাচীনতম মুসলিম বাংলা কবি না হয়, তখন আরাকান আমলের কবিরাই মুসলিম বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাবক।
রাজিয়া সুলতানা, "শাহ মুহম্মদ সগীরের কাল নির্ণায়ের সমস্যা," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বর্ষ ৩০, নং ১ (১৩৯৩): ৭১-৮৮।

[১০] আরাকানের ঐতিহ্যগত ভৌগলিক বিভাগকরণের বিষয়ে দ্রষ্টব্য - Van Galen, "Arakan and Bengal, the Rise and Decline of the Mrauk-U Kingdom (Burma) from the Fifteenth to the Seventeenth Century A.D.," 14–32.

[১১] Ayesha Irani, "Sacred Biography, Translation, and Conversion: The Nabīvamśa a of Saiyad Sultān and the Making of Bengali Islam, 1600–present" (University of Pennsylvania, 2011); আহমদ শরীফ, "সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ," *আহমদ শরীফ রচনাবলী,* ২য় খণ্ড সম্পা. আহমদ কবির, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬), ১-২৩৮।

[১২] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* ২য় খণ্ড (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮) ৩৫৪-৩৬১; d'Hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction." 28.

১৩ দ্রষ্টব্য– আলাওল, *আলাওল রচনাবলী*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭)।

১৪ অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের ভাষা।

দ্রষ্টব্য– মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দী পটভূমি* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১)।

১৫ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১); *পদ্মাবতী সমীক্ষা* (ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৮); Ghoshal, *Satyendranath, Beginning of Secular Romance in Bengali Literature,* vol. IX, Visva-Bharati Annals (Santiniketan: Visva-Bharati, 1959).

১৬ এ ধরনের ফার্সি টীকা ও সংস্কৃত টীকার সঙ্গে অনেক মিল আছে। বেশির ভাগ সময় প্রত্যেক পংক্তির উপরে টীকাকার অভিধান উল্লেখ করে কঠিন শব্দগুলোর অর্থ দিতেন, তারপর গদ্যে পংক্তির সাধারণ অর্থ দিতেন এবং শেষে তাৎপর্যার্থ আর পাঠান্তর জোগাড় করতেন। আমার জানা মতে, এ গুরুত্বপূর্ণ প্রথা নিয়ে কোনো গবেষণা করা হয় নি। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য– Gary A. Tubb, *Scholastic Sanskrit: a Handbook for Students* (New York : American Institute of Buddhist Studies, 2007).

১৭ আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০), ৬২।

১৮ Ghoshal, Satyendranath, *Beginning of Secular Romance in Bengali Literature,* 1–2.

১৯ আলাওল, *পদ্মাবতী*, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২), ২২।

২০ "In *Yoga Kalandar* and similar texts of Bengali Islamic yoga, we find, however, both a shift from the head to the heart and a disruption of the verticality of the *cakra/maqam* hierarchy." Shaman Hatley, "Mapping the Esoteric Body in the Islamic Yoga of Bengal," *History of Religions* 46, no. 4 (2007): 357.

২১ আমি অন্যত্র পুংখানুপুংখভাবে আলাওলের ব্যুৎপত্তির উৎস বিশ্লেষণ করেছি। দ্রষ্টব্য– d'Hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siècle a Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan," 196-281.

২২ আলাওল, *আলাওল রচনাবলী*, ২০১, ৩১৪।

২৩ সম্পাদিত পাঠে– *এতেরাজ*। আমি বাংলা একাডেমী আলোকচিত্র পুং নং ৪, পাতা ৮ক-এর পাঠ গ্রহণ করেছি।

২৪ সম্পাদিত পাঠে– সাগরে। ঐ ।

২৫ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯)।

২৬ আলাওল, *আলাওল রচনাবলী*, ১৪৯।

[২৭] সংস্কৃতভাষী লেখকরা মাঝেমধ্যে অনুবাদ শব্দটি প্রায় আধুনিক অর্থে ব্যবহার করত, যেমন –যচ্চৈকান্তসুবোধম অর্থঘটনাপ্রত্যগ্রসম্পাদকম। ব্যাখ্যানে ন চ কিঞ্চ সংস্কৃতগিরা তস্যানুবাদঃ কৃতঃ ।। দ্রষ্টব্য– Diwakar Acharya, "A Brief Note on Harṣapāla's Commentary on the Prakrit Kāvya Setubandha," *Newsletter of the NGMCP* no. 2 (2006): 2–4. এই তথ্যের জন্য আমি Andrew Olett-এর প্রতি ঋণী। সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাবেন এই প্রবন্ধে – Sheldon Pollock, "Philology, Literature, Translation," in *Translating, Translations, Translators, from India to the West,* ed. Enrica Garzilli, vol. 1, Harvard Oriental Series Opera Minor (Cambridge, Mass., 1996), 111–127.

[২৮] মুহম্মদ জায়সী, *পদুমাবৎ*, মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত (ইল্লাহাবাদ: ভারতী ভাণ্ডার, ১৯৭৩).

[২৯] আসলে এই চৌপাঈয়ের অংশ আর দোহা একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ। সংস্কৃতে কাশ্মিরী লেখক বল্লভদেবের *সুভাষিতাবলী* গ্রন্থে আর আনন্দধরের *মাধবানলোপাখ্যানে* প্রবাদটা আমরা পাই, এবং হিন্দীতে কবি আলম উক্ত উপাখ্যানটিকে অনুবাদ করতে গিয়ে শ্লোকটা উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য– d'hubert, "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siécle à Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan," 364.

[৩০] আলাওল, *পদ্মাবতী*, ২৮।

[৩১] Edward C Dimock and Tony K. Stewart, "Kṛttibāsa's Apophatic Critique of Rāma's Kingship," in *Questioning Rāmāyaṇas: a South Asian Tradition,* ed. Paula Richman (University of California Press, 2001), 243–264.

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি

Acharya, Diwakar. "A Brief Note on Harṣapāla's Commentary on the Prakrit Kāvya Setubandha." *Newsletter of the NGMCP* no. 2. 2006.

Benoît, Philippe. "Le Rāmāyṇa de Vālmīki et le Rāmāyṇa de Kṛttibas. Recherches comparatives en littératures sanskrite et bengalie." Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, 1994.

Charney, Michael W. "Where Jambudipa and Islamdom Converged: Religious Changes and the Emergence of Buddhist Communalism in Early Modern Arakan, 15th-19th Centuries." University of Michigan, 1999.

Dimock, Edward C, and Tony K. Stewart. "Kṛttibāsa's Apophatic Critique of Rāma's Kingship," in *Questioning Rāmāyaṇ as: a South Asian Tradition,* ed. Paula Richman. University of California Press, 2001,

Van Galen, Stephan. "Arakan and Bengal, the Rise and Decline of the Mrauk-U Kingdom (Burma) from the Fifteenth to the Seventeenth Century A.D." Leiden University, 2008.

Ghoshal, Satyendranath. *Beginning of Secular Romance in Bengali Literature.* Vol. IX. Visva-Bharati Annals. Santiniketan: Visva-Bharati, 1959.

Hatley, Shaman. "Mapping the Esoteric Body in the Islamic Yoga of Bengal." *History of Religions* 46, no. 4. 2007.

D'Hubert, Thibaut. "Histoire culturelle et poétique de la traduction. Ālāol et la tradition littéraire bengali au XVIIe siécle à Mrauk-U, capitale du royaume d'Arakan,", École Pratique des Hautes Études, 2010.

D'Hubert, Thibaut, and Jacques P. Leider. "Traders and Poets in Mrauk-U: On Commerce and Cultural Links in Seventeenth Century Arakan." *In Pelagic Passageways: Dynamic Flows in the Northern Bay of Bengal World Before the Appearance of Nation States,* edited by Rila Mukherjee, 345–379. New Delhi: Primus Books, 2011.

D'Hubert, Thibaut, and Womser, Paul. "Représentations du monde dans le Golfe du Bengale au XVIIe siécle: Ālāol et Rānīrī." *Archipel* 76. 2008.

Irani, Ayesha. "Sacred Biography, Translation, and Conversion: The Nabīvaṁśa a of Saiyad Sultān and the Making of Bengali Islam, 1600–present." University of Pennsylvania, 2011.

Leider, Jacques. "On Arakanese Territorial Expansion: Origin, Context, Means and Practice." In *The Maritime Frontier of Burma : Exploring Political, Cultural, and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800,* edited by Jos Gommans and Jacques P. Leider, 127–150. Amsterdam ; Leiden: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; KITLV Press, 2002.

Pollock, Sheldon. "Philology, Literature, Translation." In *Translating, Translations, Translators, from India to the West,* edited by Enrica Garzilli, 1:111–127. Harvard Oriental Series Opera Minor. Cambridge, Mass., 1996.

Subrahmanyam, Sanjay. "And a River Runs Through It: The Mrauk-U Kingdom and Its Bay of Bengal Context." In *The Maritime Frontier of Burma : Exploring Political, Cultural, and Commercial Interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800,* edited by Jacques P. Leider and Jos Gommans, 107–126. Amsterdam ; Leiden: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; KITLV Press, 2002.

Tubb, Gary A. *Scholastic Sanskrit : a Handbook for Students.* New York: American Institute of Buddhist Studies, 2007.

Zuber, Roger. Les *"Belles infidèles" et la formation du goût classique. Perrot d'Ablancourt et Guez de Balzac.* Paris: A. Colin, 1968.

বাংলা

আলাওল, *আলাওল রচনাবলী*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা (সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

---, *পদ্মাবতী*, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল ও রাজিয়া সুলতানা, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান*, ২ খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭-২০০৯।

তরফদার, মমতাজুর রহমান, *বাংলা রোমাণ্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দী পটভূমি*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১।

বালা, অমৃতলাল, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

---, *পদ্মাবতী সমীক্ষা*, ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৮।

মুহম্মদ জায়সী, *পদ্মাবত*, মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত, ইল্লাহাবাদ: ভারতী ভাণ্ডার, ১৯৭৩।

শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮।

---, "সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ," *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আহমদ কবির (সম্পাদিত), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

---, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০।

সুলতানা, রাজিয়া, "শাহ মুহম্মদ সগীরের কাল নির্ণয়ে সমস্যা," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* ৩০, নং ১ (১৩৯৩): ৭১-৮৮।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

এ প্রবন্ধের পাঠ মূলত ২০০৯ সালের একটি বক্তৃতার পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে লিখেছি। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক দুলাল কান্তি ভৌমিক 'বাংলাদেশ ভাষা সমিতি'তে আমার গবেষণা নিয়ে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এ সুযোগ দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ভৌমিক এবং ভাষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মনসুর মুসার প্রতি আমি অতি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ আর অসীম ধৈর্যের জন্য সাইমন জাকারিয়াকে ধন্যবাদ জানাই। আর এ প্রবন্ধখানি পরিমার্জনার কাজে আমার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী মন্দিরা ভাদুড়ী, রোচনা মজুমদার ও দীপেশ চক্রবর্তীকে তাঁদের মূল্যবান সাহায্য প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

–থিবো দুবের

*** হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পাণ্ডুলিপির চিত্র-মানচিত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নির্বাচন ও সংগ্রহ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।**

খণ্ড ১, সংখ্যা ১ | ভাবনগর | আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 | BHABNAGAR | August 2014

পাণিনি-র জাদু
বাংলা কারক সম্পর্কে পর্যালোচনা

হানা-রুথ ঠম্পসন

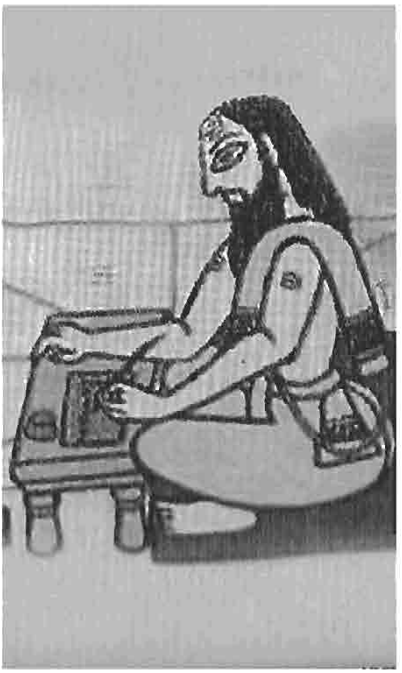

বৈয়াকরণিক পাণিনি-র কল্পিত চিত্র

Panini's Magic
Towards a Clearer Picture of the Bengali Case System

Hanne-Ruth Thompson

Abstract

This article has both a linguistic and an educational aim. It demonstrates how linguistic analysis can be done in a consistent and systematic way by discussing the Bangla case system. The article discusses the present and past confusion and disagreement about Bangla cases; it examines a number of definitions and theoretical assumptions and develops a new methodology for approaching grammatical structures.

প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য দুটিঃ এক, বাংলা ভাষা'র 'কারক' সম্বন্ধে আগের চেয়ে আরও ভাল বোধগম্যতা খুঁজে পাওয়া এবং দুই, কিভাবে সেটা করা যাবে তা বিশ্লেষণ করে দেখা। এর মানে হলো, বাংলা ভাষার প্রকৃত গঠন বিষয়ে চিন্তা করার পাশাপাশি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যৌক্তিক ও নিয়মাধীন প্রণালিকে স্পষ্ট করা। এখানে আমরা বাংলা কারকের আলোচনায় বিশেষত (১) ভাষাতত্ত্বিক ভিত্তির দিক, (২) অতীতে কারকের বিশ্লেষণ, (৩) বর্তমানে ব্যবহৃত কারকের বৈশিষ্ট্য ও সংজ্ঞা, (৪) নতুন সংজ্ঞা পাওয়ার প্রশ্ন ও বিবেচনা, এবং (৫) আমরা যদি গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা দাঁড় করাতে পারি, তবে তার বর্ণনা, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ক পর্যালোচনা করবো।

১. ভাষাতাত্ত্বিক চিত্রপট

১.১ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জগৎ

ভাষাতত্ত্বের শিক্ষাপ্রার্থীরা প্রথমে যা শেখে, তা হলো—অর্থ প্রকাশের দিক থেকে প্রতিটি ভাষার নিজের কিছু নিয়ম। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, এক দল গবেষক ১৯২০ সালে ইন্দো-আমেরিকান ভাষাসমূহের উপর প্রথমে গবেষণা করতে শুরু করেন। এতে তাঁরা ভাষার গঠনে এতো বেশি বিভিন্নতা দেখতে পান যে, ভাষা এবং বাস্তবতার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে তাদের ধারণাগুলি একেবারে পরিবর্তন হয়েছে। তাঁদের আগের ধারণা ছিলো—মানুষের চিন্তা এবং ভাষা সব জায়গায় মোটামুটি এক রকম। এইবার তাঁরা বুঝতে সক্ষম হলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে কত রকম বিভিন্নতা রয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দুজন বিখ্যাত ভাষাবিশেষজ্ঞের নামে "Sapir-Whorf" মতবাদের উদ্ভব ঘটে, যাঁরা মূলত ঐসকল ভাষাসমূহ নিয়ে ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করতেন।

প্রাসঙ্গিক অর্থে বলতে গেলে এই "Sapir-Whorf" মতবাদ দুটি ভাবানুষাঙ্গিক নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথম নীতি, ভাষাতাত্ত্বিক নির্দিষ্টতার মানে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, ধারণা ও কল্পনাগুলো ভাষা চিন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয় নীতি

অ্যাডওয়ার্ড স্যাপির

বেঞ্জামিন লী ওরফ

হলো—ভাষাতাত্ত্বিক অপেক্ষবাদ, এর মানে যারা গঠনগত দিক থেকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তাদের জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতা আলাদা। তারপর থেকে ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা ও ধারণা আরো অনেক পরিবরতন ও চড়াই-উতরাই পার করেছে।

কিছু কিছু ভাষাবিশেষজ্ঞ সমস্ত ভাষার একটি সর্বজনীন রূপ খুঁজে বের করতে চান। অন্যেরা চান—একটি শিশুর নিজস্ব ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠতে মানব মস্তিস্কের কার্যপদ্ধতির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

এগুলো খুবই আশাব্যঞ্জক এবং সম্ভবত সাফল্যজনক কাজ। কিন্তু, এমন উচ্চ উদ্দেশ্যগুলোর দিকে গেলেও একজন ভাষাবিশেষজ্ঞের আরো সরল ও সাধারণ কাজ ভাষার গঠনের ভিন্নতার বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হয়।

এখানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমার মাতৃভাষা জার্মানে কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে পার্থক্য আছে:

Ich sehe ihn (কর্ম কারক) I see him (আমি তাকে দেখি)।

Ich helfe ihm (সম্প্রদান কারক) I help him (আমি তাকে সাহায্য করি)।

ভাষার ব্যাপারে সচেতন বালিকা হিসাবে এই দুই অর্থের মধ্যকার ভিন্নতা সম্পর্কে আমার কাছে খুব স্পষ্ট ছিলো:

(i) প্রথমটিতে 'তাকে' আমার দেখার একটি বস্তু (object)।

(ii) দ্বিতীয়টিতে 'তাকে' আমার একজন সাহায্যপ্রার্থী (recipient)।

আমার মনে এই দুইটা জিনিস একেবারে আলাদা ছিলো। যখন ল্যাটিনের

পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করি, তখন আমি অবাক হয়েছিলাম ইংরেজি ভাষাভাষীরা কিভাবে 'I see him' এবং 'I help him' এই বাক্য দুটির পার্থক্য বুঝতে পারে। সে একই প্রশ্ন আমরা বাংলা ভাষার বেলায় করতে পারিঃ বাঙালিরা কি 'আমি তাকে দেখি' এবং 'আমি তাকে সাহায্য করি' এর দুটো বাক্যের মধ্যে কোনো তফাত লক্ষ করে না? এই বাক্য দুটির ভিন্ন ভাবার্থ আছে কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি স্বাভাবিকভাবে পূর্বানুমান করেছিলাম—যে কোনোভাবেই হোক বাস্তব জীবনে কর্ম কারক এবং সম্প্রদান কারকের মধ্যে এই পার্থক্য ছিলো।

১.২ ধোপাটির দুর্ভাগ্য—ব্যাকরণ কতটা বাস্তব?

ভাষাতত্ত্বের শিক্ষার্থী হিসাবে আমরা শুধু ভাষাগুলোর বিভিন্নতা নিয়ে চিন্তা করি না, বরং আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারি যে, ভাষার মধ্যে এসব সুন্দর বিভাগ, যেমন—শব্দশ্রেণী, সরল, জটিল, যৌগিক বাক্য, বিভক্তির তালিকা ইত্যাদি; এসব আসলে স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়, বাস্তব জিনিস নয়। এগুলো মানুষের কল্পনা থেকে এসেছে, মানুষের একটা ভাষাকে বোঝার চেষ্টার ফল।

আমরা চেষ্টা করছি—ভাষার মধ্যে যে অপ্রকাশিত নমুনাগুলো আছে তা, আঁচ করতে, তাদের ধরতে, তাদের বর্ণনা করতে। ভাষার ভিতরের নিয়মগুলো সম্বন্ধে আমরা যা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, তা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো সত্য নয়, বরং এটি কৃত্রিমভাবে গঠিত, মানুষের অনুসৃত সংজ্ঞা দ্বারা তৈরি। আমাদের ধারণা ও পদ্ধতিগুলো নিয়ে আমরা ভাষাটা ঘিরে এক রকম কাঠামো বানিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সে কাঠামোটা সরাসরি বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া নয়। এই পার্থক্য বোঝার জন্য একটি উদাহরণ টেনে দেখা যাক।

হরলাল রায়, তাঁর *ব্যাকরণ ও রচনা* বইতে, যেটি অনেক বছর ধরে বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকার অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই বইয়ে হরলাল রায় বাংলা ভাষার কর্ম এবং সম্প্রদানের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করেছেন। তাঁর পূর্বানুমানের ভিত্তি ছিল যে, সম্প্রদান শুধু তাকে নির্দেশ করে দেয়—যাকে কোনো কিছু দেওয়া হয়।

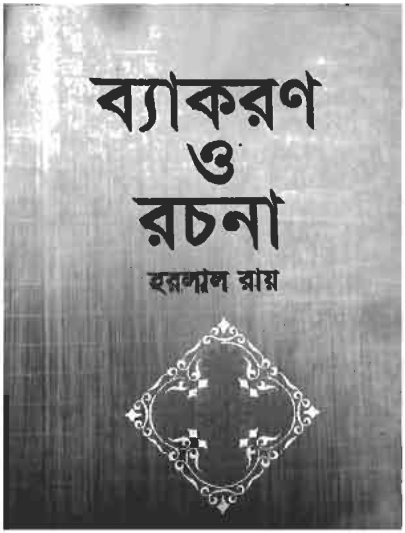

হরলাল রায়ের ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

বাংলা ভাষার কর্ম কারক এবং সম্প্রদান কারকের একই কারক নির্দেশক চিহ্ন আছে, তা দেখে রায় বলেন—আমরা যখন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিই তখন ভিক্ষুক হলো সম্প্রদান। কিন্তু আমরা যখন ধোপার কাছে আমাদের কাপড় দিই, তখন সে ধোপা সম্প্রদান কারক হতে পারে না, কেননা তাকে এই কাপড় আবার ফেরত দিতে হবে। তাহলে বেচারা ধোপাটি কোন কারকের মধ্যে পড়ে? হরলাল রায় তা বলেন নি।

ব্যাখ্যাটা শুনে আমাদের হাসি পাই। কারণ, আমরা টের পাই যে, এখানে একটা ভুল হয়েছে। ভুলটা কিসের?

হরলাল রায় একটি পদ্ধতি (ব্যাকরণ) থেকে অন্য একটিতে (প্রকৃত জীবন) লাফ দিয়েছেন। তাঁর ভাষাগঠনের আলোচনার মধ্যে হঠাৎ করে মানুষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কোনো মানুষ সম্প্রদান হয় না। মানুষ হয় ধোপা বা ভিক্ষুক, কিন্তু কারক নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই।

সম্প্রদান হচ্ছে—একটা ব্যাকরণের সংজ্ঞা, নির্দেশ মাত্র; সেটা রাস্তায় বেড়ায় না, সেটা বাস্তব নয়। সেটা জিজ্ঞাসা করেও না, এই 'দেওয়া' ক্রিয়াটার পরে কাপড়গুলো নিয়ে কি হয়? এখানেই রায়-এর ভুল হয়েছে, ভাষার গ্রাহী'র (recipient)-এর সাথে বাস্তব জীবনের গ্রাহকের ধারণা মিশিয়ে ফেলাতে।

এধরনের ভুল খুব সহজেই ধরা যায়। কিন্তু আমরা বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সামান্য গভীরে গেলেই দেখতে পাবো—আমাদের নিজেদের রেফারেন্সের কাঠামোটা নির্দিষ্ট করা কত প্রয়োজনীয়।

১.৩ ভাষাতত্ত্ববিদের সংঘাত—গবেষণার যুদ্ধ?

আমি যখন বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম, তখন বাংলা ভাষায় লেখা ব্যাকরণগুলো পড়ার জন্য আমার তর সই ছিলো না—শেষ পর্যন্ত আমি কিছু ব্যাকরণবই সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই আমি হতাশ হই। কারণ, আমি যা আশা করেছিলাম—তা আমার সংগৃহীত বইগুলোর মধ্যে পাই না।

আমার মনে প্রশ্ন আসে, ব্যাকরণ নামে প্রকাশিত ওই বইগুলোকে কি করে ব্যাকরণের বই বলা যায়? বইগুলোর অধিকাংশেই শব্দ প্রকরণ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক রূপতত্ত্ব, সন্ধি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

অধিকাংশ বাংলা ব্যাকরণবইয়ে শব্দশ্রেণীর কিছুটা কথা থাকে, সাধু এবং চলিত ভাষায় অনুশীলন দেখায়, তারপর আলোচনা করে প্রবন্ধ-চিঠি-রচনা লেখার নিয়ম। কিন্তু ব্যাকরণ?

আমার কাছে ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়—সমকালীন রূপতত্ত্ব, বাক্যগঠন, পদবিন্যাস। আমি ক্রিয়া বিশেষ্য, অনুসর্গ, ক্রিয়ার কাল সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলাম।

বিভিন্ন কারকের ব্যবহার নিয়ে চিন্তা করেছিলাম আর জটিল বাক্যের সম্ভাবনাগুলো। কিন্তু ব্যাকরণের প্রকাশিত বইগুলোর উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত বাক্যগুলো ছিল অতিরিক্ত সোজা এবং কৃত্রিম ধরনের—এগুলো থেকে আমি নতুন কিছু শিখতে পারি নি।

পূর্বে প্রকাশিত বইগুলির দিকে আমি এতটাই হতাশ ছিলাম যে, আমি সেগুলিকে খুব সহজেই অপ্রয়োজনীয় বই হিসেবে খারিজ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি যখন ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের বৈয়াকরণিক চিন্তা সম্পর্কে অধ্যয়ন শুরু করি, তখন বুঝতে পারি, ব্যাকরণ নিয়ে আমার নিজের ধারণাটার কারণেই পূর্বে প্রকাশিত বইগুলোকে আমার কাছে ব্যর্থ মনে হয়েছে।

আমি আমার গবেষণার কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করবো না, কিন্তু এখন আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি—আমার নিজের কাজের ভিত্তি কি? আর শুধু তা নয়, বরং আমি বুঝতে পেরেছি বিষয়টি দেখার বিভিন্ন পথ রয়েছে। আমি ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা সম্পর্কে জানার জন্য পাণিনিকে নিয়ে গবেষণা শুরু করি এবং ভাষার ভিন্ন এক ধারণার সন্ধান পাই।

২ ফিরে দেখা

২.১ সত্যতার সাধনা—উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাস (পাণিনি)

ভুল বোঝার শুরুটা হয়—মূলত শব্দভ্রম থেকে। যেমন আমাদের বিবেচনা করে দেখা দরকার 'case' এবং 'কারক' একই জিনিস কিনা? তেমনই তার আগে 'grammar' এবং 'ব্যাকরণ'-এর তাৎপর্যগুলো তুলনা করাদরকার।

নাম করা জার্মান সংস্কৃত ভাষার বিশেষজ্ঞ Paul Thieme[১] পাণিনির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ নিচে উপস্থাপন করা হলো। সেগুলি বিবেচনা করলে আড়াই হাজার বছর পূর্বে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে কিছুটা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

- পাণিনির কাজের উদ্দেশ্য ছিলো—সংস্কৃত ভাষার (যার নামের অর্থ হল সংযুক্ত, রচিত) নিখুঁত আর বিশুদ্ধ চরিত্র দেখানো। পাণিনির মতে, সংস্কৃত ভাষার গঠন, উপাদান, ব্যুৎপত্তি, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে গঠিত।
- সংস্কৃত ভাষার এবং শুধু সংস্কৃত ভাষার সমকালীন বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ একসঙ্গে পূর্ণ হয়—সেটা অন্য কোনো ভাষা সম্বন্ধে বলা যায় না।
- আর এমন নিখুঁতভাবে গঠিত হওয়াতে সংস্কৃত ভাষা পবিত্র কাজের জন্য উপযুক্ত।
- পাণিনির কাছে ব্যাকরণ ছিলো পবিত্র জ্ঞানক্ষেত্র, আর বৈয়াকরণিক চর্চা ছিলো একটি ধর্মীয় কর্তব্য, যার কোনো জাগতিক বা ব্যাবহারিক লক্ষ্য নেই। (পৃ.১০)

- সাম্প্রতিক ভাষাতত্ত্বে পাণিনির বিশ্লেষণগুলো এক রকম সত্যতার সাধনা বলে গ্রহণ করা হয়। তাঁর কাজের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার শব্দগঠনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যায় আর সংস্কৃত ভাষায় পবিত্রতা প্রকাশ পায়।
- পাণিনি তাঁর ব্যাকরণচর্চা একজন গুরু বা পণ্ডিত হয়ে করেন নি। করেছিলেন একজন পুরোহিতের মতো, যিনি সত্যতা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় তাঁর জীবন কাটান।

Thieme তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেন এই বলে—'পাণিনির ব্যাকরণ অধ্যয়নে আমরা মানব চিন্তার একটা চরম মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে যাই। আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞান থেকে জন্ম গ্রহণ করে একপ্রকার জাদু।' (পৃ. ২৩)

আমরা আমাদের নিজের কাজের বেলায় হয়তো এই 'জাদু'র থেকে একটু দূরে থাকতে চাই। কিন্তু এটি বিবেচনা করে আমরা দেখি যে, আমাদের কাজের মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক পরিপ্রেক্ষিত তো আছেই, তাই না? ভাষার মধ্যে নতুন কিছু পাওয়া গেলে—আমরা কি অবাক হই না, কৃতজ্ঞ হই না? অন্তত আমাদের উদ্দেশ্যের সত্যতার প্রতি তো বিশ্বাস আছে। আমরা যদিও আমাদের কাজ পবিত্র মনে করি না। তবে আমরা সত্যতা তো খুঁজি, এক রকম আদর্শ বা সুযুক্তি তো বের করতে চাই। আরো একজন বিখ্যাত আমেরিকান ভাষাবিশেষজ্ঞ Leonard Bloomfield পাণিনির ব্যাকরণকে বলেছেন—'মানব বুদ্ধিবৃত্তির সবচেয়ে বড় সৃষ্টি'।

পল থীম

লিওন্যার্ড ব্লুমফিল্ড

পাণিনির যে ব্যাকরণের চিন্তা সবার আগে শুরু করেছেন, আর এই হিসাবে ব্যাকরণ চিন্তার ব্যাপারে তাঁর যে বিশাল একটা ভূমিকা রয়েছে—তা আজো অস্বীকার করা যায় না। তার মানে—আমরা তাঁর ধারণাগুলোর দিকে তাকিয়ে চিন্তার দুয়ার বন্ধ রাখবো, আমি এই মতের পক্ষে নই।

২.২ গুনতে গেলে যে উপায়—ল্যাতিন ও সংস্কৃতের বোঝা

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে ল্যাতিন ভাষার বৈয়াকরণিক অংশ ও শ্রেণীসমূহ শুধু ভাষার নিয়ম সম্বন্ধে শেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়নি, আধুনিক ভাষার উপরেও এই ল্যাতিন নিয়মগুলি বসানো হয়েছে। এটা বুঝতে সময় লাগে না। ল্যাতিন ভাষার গঠনগুলো অনেক আগে থেকে পরিচিত—তাই আমরা এগুলি জার্মান ভাষা বা ইংরেজি ভাষার উপরেও আরোপ করি। এই পথ অনুসরণ করা আজও পর্যন্ত একেবারে ব্যাহত হয়নি।

ল্যাতিন ভাষা শব্দরূপের একটি ওয়েব-সাইট থেকে এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। এটি নিয়ে আমরা আমাদের আসল বিষয় কারকের কাছে যাচ্ছি। আমরা এখানে কারক বলে আসলে case বোঝাতে চাই। এই দুটার মধ্যে পার্থক্যগুলো পরে আলোচনা করবো। ল্যাতিন ভাষা শব্দরূপের ওয়েব-সাইটে বলা হয়েছে:

- কর্তৃ কারক—যেটি একটি বাক্যের কর্তাকে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয় এবং সংযোজক ক্রিয়া (copular)-র সঙ্গেও ব্যবহৃত হয়।
- সম্বোধন কারক—যেটি প্রত্যক্ষ উক্তিতে কাউকে বা কোন কিছুকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়।
- সম্বন্ধ কারক—যেটি মালিকানা, পরিমাণ বা উৎসকে প্রকাশ করে। ইংরেজি ভাষায় 'of' অনুসর্গটা এই কারককে নির্দেশ করে।
- সম্প্রদান কারক—যেটি কোনো কার্যের গ্রাহীকে নির্দেশ করে, ক্রিয়ার গৌণ কর্ম। ইংরেজি ভাষায় 'to' এবং 'for' অনুসর্গগুলি একই কাজ করে।
- কর্ম কারক—যেটি ক্রিয়ার মুখ্যকর্মকে নির্দেশ করে।
- অপাদান কারক—যেটি বিচ্যুতি, যাওয়ার দিক বা একটা কাজের উপায় নির্দেশ করে। ইংরেজি ভাষার 'by', 'with' এবং 'from' অনুসর্গগুলো একই কারককে নির্দেশ হয়।

বর্তমান সময়ের কোনো ভাষাবিশেষজ্ঞ দাবি করবেন না যে, 'to Mary' সম্প্রদান কারক এবং 'from Mary' অপাদান কারককে নির্দেশ করা উচিত। কিন্তু এখনও মোটামুটি স্বীকার করি যে, 'of the people' হলো সম্বন্ধ কারক। এটা দেখে বুঝতে পারি ল্যাতিন ভাষার ইংরেজি ভাষার উপরে এখনও কত তীব্র প্রভাব রয়েছে।

এই একই কথা বাংলা এবং সংস্কৃতি ভাষার ক্ষেত্রেও সত্যি। তিনটি বৈয়াকরণিক লিঙ্গ আর তিনটি বচন নিয়ে সংস্কৃত ভাষাটি খুব রূপ পরিবর্তনীয় একটি ভাষা। এর কারকের সংখ্যা ৮ টিঃ কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, সম্বোধন এবং অধিকরণ। তার তুলনায় বাংলা ভাষার গঠনগুলি অনেক সোজা। এটির কোনো ব্যাকরণগত লিঙ্গ নেই, একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য রক্ষিত হয়—শুধুমাত্র সর্বনামে ও বিশেষ্যের বিভক্তিতে। বিশেষণের কোনো রূপভেদ নেই। তা সত্ত্বেও এই ধারণাগুলো প্রায় প্রতি বাংলা ব্যাকরণ বইতে এখনও উপস্থিত।

ভাষার ইতিহাস থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে অনেক ভুল ধারণাও চলে আসে। সে কারণে আরো জরুরি কাজ হচ্ছে—আধুনিক ভাষাগুলো তাদের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা থেকে পৃথক করা এবং তাদের বর্তমানের অবস্থায় বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা।

তাহলে আমরা বাংলা ভাষার কারকের বিষয়ে কিভাবে আলোচনা করবো? তা করতে গেলে—বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যতক্ষণ বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদেরা নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারবেন না—বাংলা বিশেষ্যের কয়টা আর কোন কোন কারক আছে, ততক্ষণ এই বিভিন্ন পদ্ধতি খুব অধ্যবসায়ী এবং পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

এইবার বাংলা ভাষার কারকের সংজ্ঞা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন আসবে—আমরা তাহলে কি শর্তানুসারে কারককে সংজ্ঞায়িত করবো? এবং শর্তগুলো পাওয়া গেলেই, সেগুলি মূল্যায়ন করবো কি করে?

৩ ভাষার অবয়ব গঠন—সংজ্ঞা

৩.১ কারকের সংজ্ঞা

শুরু থেকে 'case' এবং 'কারক'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা খুব দরকার। 'কারক' শব্দটি সংস্কৃত পদ 'karaka' থেকে এসেছে। কিন্তু তার আলোচনার আগে আমরা 'case'-এর দিকে একটু নজর রাখব। ইন্টারনেটে আমরা এই কয়েকটা সংজ্ঞা পাইঃ

"একটি শব্দরূপ হলো—বিশেষ্য ও সর্বনামের শেষাংশের নির্ধারিত প্যাটার্ন। ব্যাকরণগত দিক থেকে 'case' বিশেষ আকার নির্দেশ করে।"

অথবা

"বৈয়াকরণিক 'case' হলো—বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত বিশেষ্য বা সর্বনাম।"

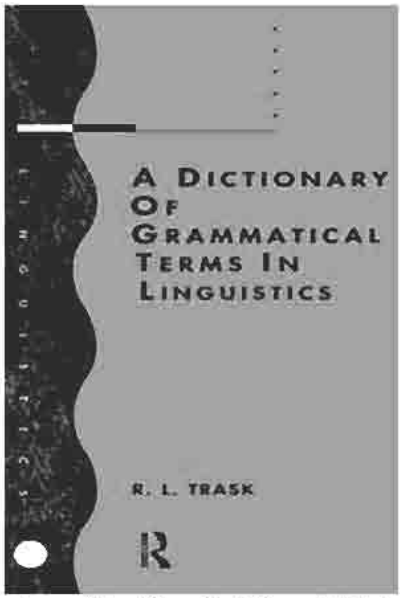

আর. এল. ট্রাস্ক প্রণীত এ ডিকশনারি অব গ্রামাটিক্যাল ট্রাম্স ইন লিঙ্গুস্টিকস গ্রন্থের প্রচ্ছদ

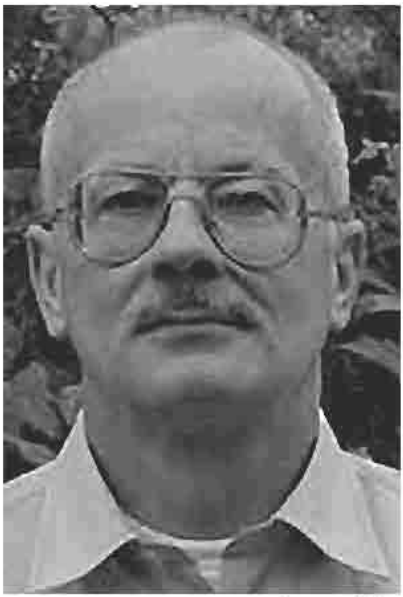

আর. এল. ট্রাস্ক

অথবা

"বৈয়াকরণিক 'case' হলো—বিশেষ্য এবং সর্বনামের বিভক্তি, যেগুলি বাক্যের মধ্যে সম্পর্কগুলি নির্দিষ্ট করে।"

এই সংজ্ঞাগুলো একটা সাধারণ ধারণা দিচ্ছে, কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট অবয়ব দাঁড় করায় না। এই সংজ্ঞাগুলোর আকার, ব্যবহার এবং কর্মপদ্ধতি একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এ পর্যন্ত আমরা শিখেছি যে, 'case' একটি বাক্যের শব্দের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করে, কিন্তু সম্পর্কটা কি ধরনের এবং বাক্যের কোন অংশগুলোর মধ্যে তা আমাদের জানা দরকার।

R.L.Trask-এর *A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics* (1993, P. 35) বই-এর মধ্যে একটা আরো বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়:

"Case: একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যমান আকার, যা বিশেষ্যবন্ধতে (NP, noun phrase) লাগানো হয় আর যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই বিশেষ্যবন্ধ একটি শনাক্তযোগ্য বৈয়াকরণিক ও শাব্দিক সম্পর্ক বহন করে।"

এই সংজ্ঞাটিও আমদের বেশি গভীরে নিয়ে যায় না। কিন্তু ইন্টারনেট-এর নির্দেশিত বিভক্তি প্রত্যয় ও শব্দাংশ এবং Trask-এর 'overtly marked forms'

থেকে আমরা পাই যে, বিশেষ দৃশ্যমান আকারের সঙ্গে 'case' এর কিছু সম্পর্ক আছে এবং তা থেকে আমরা গঠনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'case'-কে চিহ্নিত করতে পারি। তাহলে আমরা প্রথম প্রাথমিক এ পর্যন্ত বলতে পারি,

সংজ্ঞা ১: 'case' হলো—বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যের একটি বৈশিষ্ট্য, যা থেকে বাক্যের অন্য অংশের সঙ্গে এই বিশেষ্যের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়।

অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞার উপরে নজর রাখলে, নিচের মতো বক্তব্যটি পাওয়া যায়:

case হলো—বাক্যের বিশেষ্যবন্ধ এবং ক্রিয়ার মধ্যে একটি ভাববাচক সম্পর্ক। একটি বাক্যের মৌলিক কাঠামো গঠিত হয় একটি ক্রিয়া এবং এক বা একাধিক বিশেষ্যবন্ধ দিয়ে, যেগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত একটি বিশেষ সম্পর্কটি বোঝায়। একটা সরল বাক্যের মধ্যে case শুধু একবার সংঘটিত হয়।[২]

সম্পর্কগুলোর দ্বিতীয় অংশটা পাওয়া গেছে, যথা—ক্রিয়াপদ। কিন্তু এই সম্পর্কের প্রকৃতি বা ধরন ব্যাখ্যা করা হয় নি। Trask ব্যাকরণগত এবং শব্দগত সম্পর্কটি নির্দেশ করেছে এবং এতে করে আমরা দুই ধরনের কার্যপ্রণালি পেয়েছি।

(ক) আমরা বাক্যগঠনের দিক থেকে পদ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে কথা বলবো। প্রতি ক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বিশেষ্যগুলিকে (যেমন—উদ্দেশ্যে, মুখ্যকর্ম, গৌণকর্ম) টান করার ক্ষমতা আছে। আমরা সেটাকে verb valency বলি।

(খ) আমরা Fillmore-এর শব্দার্থিক নিয়ম মেনে নেবো, যার বাক্যের মধ্যে অংশগুলো হলো কর্তা, গ্রাহী, উদ্ভব, সময়, স্থানের ইত্যাদির ধারণা। এই উপায় পেয়ে আমরা এখন আরো দুটি সংজ্ঞা দিতে পারি:

চার্লস ফিলমোর

সংজ্ঞা ২: ক্রিয়ার পদবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা case-কে নির্দেশ করা যায়। প্রত্যেকটি ক্রিয়া একটি বিশেষ বিশেষ্যবন্ধ-এর সমষ্টিকে নির্বাচন করে, যেমন—কর্তা এবং প্রত্যক্ষ কর্ম। এসকল বিশেষ্যবন্ধ case-কে উপস্থাপন করে।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করি—এটি এতোই সংকীর্ণ সংজ্ঞা যে শুধু

ক্রিয়াপদের প্রয়োজনীয় বাক্যাংশ (যেমন—উদ্দেশ্য ও কর্ম) এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য সব বাক্যাংশ, যেমন—ক্রিয়া বিশেষণ (Adverb) বা অনুসর্গের (Postposition) শব্দগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 'সকালে', 'রাস্তায়', 'শুরু থেকে', 'নিশ্চয়ই', 'অবশেষে' এগুলো সব ক্রিয়ার কাছে গুরুত্ব না পেয়ে কারক হিসেবেও ভূমিকা পায় না।

সংজ্ঞা ৩: case হলো—একটি শব্দার্থতিক ধারণা, যেটি বিশেষ্যবন্ধ প্রকাশ পায় আর যার ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ একটি সম্পর্ক থাকে।

এটি একটি বিশুদ্ধ শব্দবৈজ্ঞানিক (semantic) সংজ্ঞা এবং একেকটা ভাষার জন্য সেটা বিন্যস্ত করতে হবে।

৩.২ কারক—অনুশীলন

উপরের সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে একটাও সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর নয়। কিন্তু আরো সন্তোষজনক সমাধান খোঁজার আগে আমাদের দেখা উচিত—বাংলা ব্যাকরণের বইয়ের মধ্যে কারক বিষয়টি কিভাবে আলোচনা করা হয়। বাচ্চাদের জন্য লেখা বইতে খুব গভীর তাত্ত্বিক আলোচনাগুলি থাকবে না, তা তো সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কারক বিষয়টি সব স্কুলের ব্যাকরণের বইয়ের মধ্যে অনিবার্য। উপরের অনুচ্ছেদে আমরা case-এর সংজ্ঞা নিয়ে কথা বলেছি। কারকের বেলায় জানা দরকার যে, কারকের ঐতিহ্যগত আলোচনার মধ্যে বিশেষ্যের বিভক্তির কোনো ভূমিকা নেই। কারক হচ্ছে—একটি শব্দার্থিক সম্পর্ক, যার বাইরের কোনো চিহ্ন নাও থাকতে পারে। তাহলে আমরা কারকের বেলায় আমাদের প্রথম গঠনতাত্ত্বিক সংজ্ঞাটিকে (সংজ্ঞা ১) এবার বাদ দিয়ে পারি।

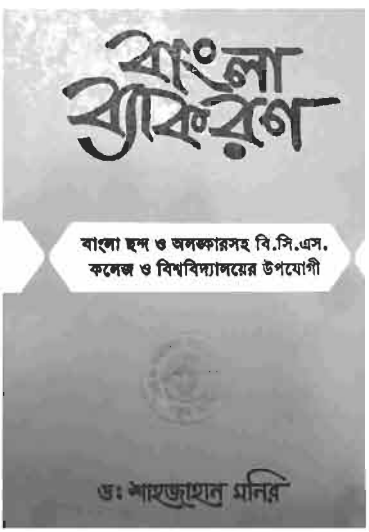

বাংলা ব্যাকরণ-*এর প্রচ্ছদ*

কারককে উপস্থাপন করার একটি সাধারণ পন্থা হলো—একটি উদাহরণ দিয়ে কারকের ব্যবহার দেখানো। এই রকম উদাহরণ সকল ব্যাকরণের বইয়ের মধ্যে থাকে। সাধারণত ক্রিয়াপদ 'দেওয়া'র কারণ 'দেওয়া' ক্রিয়াপদের উদ্দেশ্য ছাড়া দুটা কর্ম (মুখ্যকর্ম এবং গৌণকর্ম) প্রয়োজন।

নিচে সাধু ভাষার একটি নমুনা বাক্য দেওয়া হলো, আর আপনারা তা দেখে বুঝতে পারবেন—কেন আমি এরকম

উদাহরণ, কৃত্রিম ধরণের বাক্য বলে মনে করি। আমি এখানে ইংরেজি অনুবাদ দিচ্ছি। কিন্তু, মনে রাখতে হবে—কারক নির্দেশকগুলি এসব লেখকের নিজের দেওয়া। ইংরেজি তুল্য নামগুলো আমি উদ্ধৃতি কমার মধ্যে দিচ্ছি। কারণ, এগুলো এখনও বিশ্লেষণ করা হয় নি।

বাক্য: ঢাকায় নবাব ধনাগার হইতে স্বহস্তে দরিদ্রদিগকে টাকা দিতেছেন।[৩]

ঢাকায়	নবাব	ধনাগার হইতে	স্বহস্তে	দরিদ্রদিগকে	টাকা	দিতেছেন
dhaka(loc)	nawab	tresury+from(pp)	own hand (loc)	to poor(pl,obl)	taka	give (3rd ps hon, pres cont)

The Nawab of Dhaka himself is giving money from the treasury to the poor.

ক্রিয়া	বিশেষ্যবন্ধ	বিভক্তি	অর্থ	কারক	ইংরেজি তুল্য নাম
	নবাব		কে	কর্তা	'nominative'
	ঢাকা	-য়	কোথায়	অধিকরণ	'locative'
	টাকা		কি	কর্ম	'accusative'
	ধনাগার থেকে	হইতে/থেকে	কোথা থেকে	অপাদান	'ablative'
	দরিদ্রকে	*দিগকে	কাকে	সম্প্রদান	'dative'
	নিজ হাতে	-এ	কি দ্বারা	করণ	'instrumental'

*-'দিগকে' হলো সাধু ভাষার রীতি, যার চলিত বহুবচনের রূপ হলো—'দের'।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখি—আমাদের দ্বিতীয় সংজ্ঞা (সংজ্ঞা ২) যা ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সেটিও এখানে উপযুক্ত নয়। 'দেওয়া' ক্রিয়াপদের শুধু তিনটা বিশেষ্যবন্ধ (noun phrase) দরকার, একটি হচ্ছে উদ্দেশ্য (subject, কর্তা কারক), একটি মুখ্যকর্ম (direct object, কর্ম কারক) আর একটা গৌণকর্ম (indirect object, সম্প্রদান কারক)। ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য বিশেষ্যবন্ধের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলা ভাষাবিশেষজ্ঞগণ প্রায়ই ক্রিয়ামূলক ভূমিকা বা কার্যকর ভূমিকা হিসাবে কারককে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এগুলো সম্বন্ধে আমাদের এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই। এখনও বাকি আছে আমাদের তৃতীয় সংজ্ঞাটি যা শব্দার্থ বিদ্যায় উপরে নির্ভর করে।

তার দিকে নজর রাখার আগে আমাদের পরবর্তী আলোচনার জন্য আরো দুটি উল্লেখযোগ্য কথা বলে নিতে হবে। একটি হলো—*হইতে/থেকে* অনুসর্গটি (postposition) কারকের মধ্যে একটা ভূমিকা পায়। তাহলে কি আমাদের অনুসর্গগুলো বিশেষ্য বিভক্তির মতো দেখতে হবে? অন্যটি হলো—আমাদের প্রদত্ত বাক্যের মধ্যে কোনো সম্বন্ধপদ বা কারক অনুপস্থিত। সম্বন্ধপদ যে প্রায়ই শুধু একটা

বিশেষ্যবন্ধের ভিতরের (যেমন—'আমার বাবার গাড়িতে') সম্পর্কটা বুঝিয়ে দেয়, নিজ থেকে ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করে না, তা আমরা সোজাভাবে গ্রহণ করি, তবে বাংলা ভাষার বহু নৈর্ব্যক্তিক বাক্য আছে যেখানে সম্বন্ধ কারক সরাসরি ক্রিয়া পদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। নিচের বাক্যগুলো দেখুন:

(iii) আমার খিদে পেয়েছে।
of me (gender) hunger receive (3rd ps, present perfect)
I am feeling Hungry.

(iv) ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছে।
the boy (object) of me (gender) well attach (3rd ps, present perfect)
I liked the boy.

(v) তার ভয় করছে।
of him(gender) fear do (3rd ps, present continuous)
He is afraid.

এখানে সম্বন্ধ উদ্দেশ্যগুলির (আমার, আমার, তার) ক্রিয়াপদের সঙ্গের সম্পর্ক স্পষ্ট—তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। পরবর্তীকালে আমি এই বিষয়টিতে আবার ফিরে আসবো।

৩.৩ কারক-তত্ত্ব

"কারকের সংজ্ঞা—পুনরাগমন" প্রবন্ধে, Achyutananda Dash[৪] সংস্কৃত ব্যাকরণের কারকের ধারণার বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে পুনঃমূল্যায়ন করেন। বাংলা ভাষার উপর খুব সামান্যই তাত্ত্বিক কাজ করা হয়েছে এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণে যেটুকু পাওয়া যায়—তা সংস্কৃত ভাষা গবেষণার উপর ভিত্তি করে পাওয়া। তাই আলোচনাটি এখান থেকে শুরু করা যাক। Dash বলেন :

"কারক ও ক্রিয়াপদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বাক্যের মধ্যে শুধু তাকেই কারক বলা যায়—যার ক্রিয়ার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে।" (পৃ. ১১৩)

Dash-এর প্রবন্ধের পরের অংশে কারক এবং ক্রিয়ার 'পারস্পরিক প্রত্যাশা' বিষয়ে মন্তব্য লাভ্য। এই সংজ্ঞা আবার ক্রিয়ার বিশেষ্যকে টান করার ক্ষমতার কথা (verb valency) মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু Dash, যেসব বিশেষ্য বিভক্তি আর অনুসর্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। গঠনগত সম্পর্কের চেয়ে তার আলোচনায় কারকের দর্শনগত মূল্যই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, অবশ্য তিনি বিভক্তিকে 'কারকের সম্পর্কের প্রকৃত নির্দেশক' হিসেবে অভিহিত করেন। (পৃ. ১২১)

এখন আমরা দেখবো এই বক্তব্যগুলো কিভাবে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। কলকাতার ভাষাবিশেষজ্ঞ পবিত্র সরকার তাঁর ছোট *পকেট বাংলা ব্যাকরণ* বইয়ের মধ্যে নতুন চিন্তার প্রকাশ করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে ইতস্তত করেন না। তিনি বাংলা কর্ম ও সম্প্রদান কারকে একই বিভক্তির ব্যবহার দেখে সোজাভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, সম্প্রদান আমাদের বাংলা ভাষার বেলায় আর দরকার পড়ে না, একে প্রত্যাখ্যান করা যায়। 'বাংলা ভাষার শুধু কর্ম কারক আছে।'

এই বক্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য হলো—পবিত্র সরকারের সিদ্ধান্তটি বিভক্তির উপরে নির্ভর করে, মানে কারক বিভক্তি ছাড়া হয় না। তাঁর ধারণাগুলি আলোচনার আগে আমরা কারকের শ্রেণীবিভাগ দেখে নিই। সরকার দাবি করেন যে—বিভক্তির উপস্থিতি কারকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে এবং বিভক্তির সঙ্গে কয়েকটি অনুসর্গও তাঁর তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

এখানে পবিত্র সরকারের বাংলা কারকের তালিকা দেওয়া হলো:

কারক	বিভক্তি (case maker)	অনুসর্গ
কর্তা "nominative"		
নোট: কর্তা কোনো কারক হিসেবে বিবেচিত নয়, কারণ এর কারকের মতো কোনো নির্দেশক চিহ্ন নেই।		
কর্ম "accusative"	-কে	
সম্বন্ধে "genitive"	-র, -এর	
অধিকরণ "locative"	-এ, -তে	
অপাদান "ablative"		থেকে
করণ "instrumental"		দ্বারা, দিয়ে
নিমত্ত "benefactive"?, "causative"?	-র, -এর	জন্য, কারণ

একটি স্কুলের পাঠ্যবই আর একটি জনপ্রিয় ব্যাকরণের বই থেকে কারকের এই দুই শ্রেণীবিভাজন পড়ে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারটি দেখতে পাই। আমি এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আরো ডজন খানেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট এবং পদ্ধতিগত উপায়ে চিন্তা শুরু করার জন্য যথেষ্ট উপকরণ আমাদের হাতে আছে।

৪ ব্যাকরণগত বাস্তবতা

এই প্রবন্ধের শুরুতে আমি বলেছিলাম যে, ব্যাকরণ একটি কল্পনায় গঠিত বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। তার কোনো বাস্তবতা নেই। এর মানে এই নয় যে, জিনিসটা নিজের ইচ্ছেমতো বানানো। বরং আমরা যতদূর একটি সংবদ্ধ, কাল্পনিক নিয়মের মধ্যে কাজ করি, ততদূর আমাদের সবসময় খুব সাবধানে এবং যুক্তি দিয়ে কাজ করতে হয়, বিশেষভাবে সংজ্ঞা নিরূপণের সময়। এবার ফিরে যাওয়া যায় আমাদের মৌলিক তিনটি case-এর সম্ভব্য সংজ্ঞায়, এগুলো বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কতটুকু উপযুক্ত, তা দেখতে।

৪.১ গঠনতত্ত্ব—সহজ এবং নিরাপদ

সংজ্ঞা ১ হলঃ case হলো বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যের একটি বৈশিষ্ট্য, যা থেকে বাক্যের অন্য অংশের সঙ্গে এই বিশেষ্যের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়।

Charles Fillmore নামে একজন ভাষাবিশেষজ্ঞ case-এর অর্থ নিয়ে ১৯৭০ দশকে সম্পূর্ণ নতুন ব্যাকরণের তত্ত্ব তৈরি করেছেন। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয় ভাষার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রূপতাত্ত্বিক সংজ্ঞাই মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। এমনকি সংস্কৃতে কারকের ব্যাখ্যা, যার অন্তর্গত বিভিন্ন দার্শনিক দিকগুলো, একটি বিশেষ্যের নানা অবস্থায় কতরকম বিভক্তি যুক্ত হতে পারে তার উপর নির্ভর করে। বিভক্তি হলো—এক ধরনের সংকেত বা আলোকবিন্দু, যা আমাদেরকে পথ দেখায়।

সে আলোকে ল্যাতিন ভাষায় পাঁচটি case আছে (যথাঃ কর্তা, সম্বন্ধ, সম্প্রদান, কর্ম, অপাদান)। জার্মান ভাষার আছে চারটি কারক, ইংরেজি বিশেষ্যের মধ্যে শুধু দুইটি—কর্তা এবং সম্বন্ধ। কিন্তু, ইংরেজি সর্বনামের মধ্যে কর্ম কারকও রয়েছে। এই একই হিসেবে বাংলা ভাষার চারটি কারক নির্দেশ করা যায়। সেগুলো নিচে দেখানো হলো ('৫.২ case-এর বাস্তবতা' দ্রষ্টব্য)। এখন চোখে পড়ে যে, বাংলা ভাষায় কর্তা কারকের সাধারণত কোনো বিকাশিত কারক চিহ্ন (বিভক্তি) নেই। তাহলে আমরা কি করে কর্তা কারক নির্দিষ্ট করতে পারি? সেটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা আর ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার।

এই সহজ বিশ্লেষণ নিয়ে আমরা তৃপ্ত মনে কাজ শেষ করে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু তা আমরা করতে পারি না। কারণ, বাংলা ভাষার আরো দুএকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

৪.২ ক্রিয়াপদের কার্যপ্রণালি—শক্ত হাতে লাগাম ধরা

সংজ্ঞা-২ : ক্রিয়ার গঠনমূলক প্রয়োজন দ্বারা case-কে নির্দেশ করা যায়।

প্রত্যেকটি ক্রিয়া কতগুলো নির্দিষ্ট বিশেষ্য নির্বাচন করে আর সে নির্বাচনটি কারকের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। আমরা আগে দেখেছি যে, এই সংজ্ঞাটি

আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। ক্রিয়াপদের যা দরকার (যেমন—উদ্দেশ্য অথবা মুখ্যকর্ম) তা তো আমরা ক্রিয়ার বেলায় বিবেচনা করতে পারি। তাতে আমরা কারক ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দেবে কেন? Dash-এর 'পারস্পরিক প্রত্যাশা' আর এই সংজ্ঞার তাৎপর্য প্রায় একই। তারপরে আমার মনে হয় যে, কারকের কারকের সংজ্ঞা শুধু শব্দার্থে নিয়ে (সংজ্ঞা ৩, নিচে) তৈরি করা যাবে না।

একবার এই সংজ্ঞা ৩ (Fillmore-এর case semantics) বিবেচনা করে দেখা যাক—এই দুই সংজ্ঞা মিলিয়ে বাংলা ভাষার জন্য উপযুক্ত একটা নতুন সংজ্ঞা পাওয়া যাবে কিনা।

৪.৩ শব্দার্থবিদ্যা—বিস্তৃত মুক্ত বিচরণক্ষেত্র

সংজ্ঞা-৩: case হলো একটি শব্দার্থতিক ধারণা যেটি বিশেষ্যবন্ধ দ্বারা প্রকাশ পায় আর ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ একটি সম্পর্ক থাকে।

কারককে এইভাবে নির্দিষ্ট করতে গেলে কারকের সংখ্যার আর কোনো সীমা থাকবে না। পৃথিবীর ভাষাদের মধ্যে ৫০ বা ৬০টি নির্দিষ্ট কারক আছে, যা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ পায়। ফিনল্যান্ডের ভাষার মধ্যে ১৫টি কারক আছে। আমরা যদি, পবিত্র সরকারের মতো, বিভক্তি চিহ্নগুলোর সঙ্গে অনুসর্গও কারকের চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে সীমারেখাটা কোথায়? যদি আমরা 'থেকে' (*From* - ablative), 'জন্য' (*for* - benefactive) এবং 'দিয়ে' (*with* - instrumental),

পবিত্র সরকার

পকেট বাংলা ব্যাকরণ *গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

এগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পরি, তাহলে কেন আমরা 'মত' (*like* - conformative), 'সঙ্গে' (*with* - comitative), 'পরিবর্তে' (*instead* - mutative) এগুলো গ্রহণ করবো না কেন? অথবা অন্যান্য আরো ডজনখানেক শব্দকে? যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে বিশেষ শব্দগত ধারণার একটি নাম আছে, এই নাম হিসাবে case-কে না বিবেচনা করার মতো কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। আছে কি?

এখানে আমরা দেখতে পাই যুক্তির আর অর্থহীনার মধ্যে খুব চিকন, সরু একটি রেখা। কারকের এই সংজ্ঞাটা গ্রহণ করলে, কারক জিনিসটা ব্যর্থ হয়ে গেলো। কারক নিয়ে চিন্তাটা আমাদের বিশ্লেষণ ক্ষমতার উপকারি হওয়া এবং আমাদের উপলব্ধি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। তা না হলে আমরা এর উপর যেমন নিয়ন্ত্রণ হারাবে, তেমনি এর উদ্দেশ্যও লুপ্ত করে দেবো।

পবিত্র সরকার বিভক্তির সঙ্গে যেভাবে অনুসর্গগুলো বেছে নিয়েছেন, তা অবশ্য এলোমেলোভাবে করেন নি। case নির্দেশক হিসেবে সকল অনুসর্গ অন্তর্ভুক্ত করা তাঁর কোনো অভিপ্রায় ছিল না। তবে এই বিশেষ শব্দগুলোকে বা কেন কারক বলেছেন? সংস্কৃত কারক-এর সঙ্গে অবশ্য একটা মিল রয়েছে, কিন্তু আমরা মনে করি এগুলোর সংস্কৃত একটা কারণ, একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া দরকার। আমরা যদি *থেকে* অনুসর্গটি কারকের মধ্যে গ্রহণ করে *পরিবর্তে* অনুসর্গটি বর্জন করি, তাহলে এর কারণটা কি? পবিত্র সরকারও এইরকম ব্যাখ্যা করতে যান নি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াও, এই সকল case-এর শ্রেণীকরণের কিছু অন্তর্লব্ধ বৈশিষ্ট্য আছে। Fillmore ব্যাকরণ তত্ত্বে case-এর উপর ভিত্তি করেও, কয়েকটি 'Additional case'-এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। এটা হুমায়ুন আজাদ কটাক্ষ্যের সাথে তাঁর ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত (quote) করেছেন।

হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

হুমায়ুন আজাদ

কিন্তু Fillmore-এর ব্যাকরণ তত্ত্বে এই 'Additional case'-এর প্রয়োজনীয়তার কথা কোথা থেকে এলো? এবারে এ সম্পর্কে Fillmore-এর নিজস্ব কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই। Fillmore বলেন:

case-এর ধারণাটি মানুষের সাধারণ অবস্থাগুলোকে বর্ণনা করে। যেমন—কি হয়, কবে হয়, কোথায় হয়, কে কি ঘটায় ইত্যাদি ঘটনাগুলো আমরা কিভাবে বিচার করি? আসলে, এসব ব্যাপার একটা ভাষার মধ্যে কারক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

এই বক্তব্যটি বেশ অস্পষ্ট। বিংশশতাব্দীর একজন বিখ্যাত ভাষাবিশেষজ্ঞ তাঁর নিজের বিষয় নিয়ে যদি এরকম অনিশ্চিতভাবে কথা বলেন, তাহলে আমরা কি পবিত্র সরকারকে সংস্কৃত ভাষার প্যাটার্নে তাঁর বাড়তি কারকগুলো বাংলা ভাষার মধ্যে ঢুকানোর জন্য দোষারোপ করবো? এসব প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমরা একটা নতুন জায়গায় প্রবেশ করেছি।

ভাষাতত্ত্বের প্রান্তে, যেখানে উপলব্ধি, যাচাই, আন্দাজ ভেসে যায়, যেখানে আমরা জানি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারি না। ভাষাতাত্ত্বিক কাজে এরকম আন্দাজ করার কারণ নেই। কিন্তু এই প্রান্তের জায়গাটা আমাদের মনে রাখা দরকার—আমি যে বাংলা ভাষার কর্তা (শূন্য বিভক্তি) একটি কারক হিসেবে দাঁড়া করতে চাই, সেটাও এ রকম একটা আন্দাজ, একটা intuition। এর তাত্ত্বিক প্রতিপাদন এখনও বাকি আছে।

৫ ফলাফল এবং উপসংহার

এতদূর এসে বেশি উত্তর না দিয়ে, আমি অনেক প্রশ্ন করেছি। তবে সেটা গবেষণাবিদ্যা উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এবার আমরা একটু বাংলা কারকের নিয়মের দিকে চোখ রাখবো। বাংলার কারকের পদ্ধতির ফলাফল কি? কি সম্ভাবনা আর সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে? আমরা কি case এবং কারকের মধ্যে যা যা পার্থক্য পেয়েছি, তা নিয়ে নতুন একটা উপায় বানাতে পারবো?

৫.১ কারকের কার্যকারিতা/ভূমিকা

আমরা যদি কারকের শব্দার্থিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে কিছু কার্যকরী উপাদান সংযুক্ত করি, তাহলে সেটা কেমন হবে? Fillmore-এর case-এর একটা শর্ত ছিল যে বাক্যের মধ্যে প্রতি case শুধু একবার সংগঠিত হতে পারে। বিভক্তি হিসেবে এই শর্ত পূর্ণ হয় না। আমাদের ব্যাকরণের বই থেকে নেওয়া সেই বাক্যটিতে স্থান (ঢাকা) এবং পাত্র (সহস্তে) উভয়ে locative case-এ (অপাদান) দেওয়া। তা থেকে আমাদের শব্দার্থিক সংজ্ঞাটা, যা রূপতাত্ত্বিক বিভক্তি উপেক্ষা

করতে পারে, তার সমর্থন আরো শক্তিশালী হয়ে যায়। কিন্তু শব্দার্থিক কারকের মধ্যে কোনগুলো আমরা গ্রহণ আর কোনগুলো প্রত্যাখ্যান করবো? এও এক প্রশ্ন বটে।

৫.২ Case-এর বাস্তবতা

ধরে নেয়া যাক—বাংলা ভাষার চারটি case নিয়ে (কারক নয়!) একটা রূপতাত্ত্বিক নিয়ম। এই চারটি case যে-কোনও বাংলা ভাষার লেখার মধ্যে সহজে শনাক্ত করা যায়। তাদের বিভক্তি মাধ্যমে শনাক্ত করা যায়। বিশেষ্য কাঠামোর উপ-নিয়মে (sub-system) এই কারকগুলো পাওয়া যায়। যেমন—অসমাপিকা ক্রিয়াগুলো ক্রিয়ার কাঠামোর একটা উপ-নিয়ম, তেমনই কারক হচ্ছে বিশেষ্যের একটা উপ-নিয়ম।

এবার আমরা উদ্ধৃতি কমাগুলো বাদ দিয়ে এই কারকের নামগুলো ব্যবহার করতে পারি। সম্বন্ধ কারকের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিধা ঝেড়ে ফেলতে পারি, কারণ আমরা দেখেছি যে, বাংলা ভাষার প্রচুর উদাহরণ আছে যেখানে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধবাচক বিশেষ্যের সরাসরি সম্পর্ক আছে। নিচের তালিকা তাহলে সোজা, অটল এবং নির্ভরযোগ্য, যার মধ্যে নতুন বেশি কিছু নেই।

Case	বিভক্তি	ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক
কর্তা	-----	উদ্দেশ্য
কর্ম	-কে	মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম
সম্বন্ধ	-র, -এর	নৈর্ব্যক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য
অধিকরণ	-এ, -তে	সময়, স্থান, ভাব, পাত্র

এভাবে আমরা সুন্দর ছোট একটা রূপতাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছি আর এতে যুক্তিরও কোনো অভাব নেই। এখন বাকি থাকলো কোন কোন শর্ত ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কারকগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটা বের করা।

৫.৩ কারকের গুরুত্ব

কারকের শব্দার্থবিদ্যা অনুসারে গঠিত চরিত্র আর তাকে বিভক্তি থেকে আলাদা করার সম্ভাবনা বাংলা ব্যাকরণ গবেষণার পথে নতুন একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপায় উন্মোচন করে। স্পটলাইট পথ দেখায়, বিভক্তিকে ঠিক সেইভাবে বিবেচনা করার পরিবর্তে বরং এগুলোকে উপজাতক, বস্তুগত কখনওবা ঐচ্ছিক অথবা কোনো একটি বিষয়ের আরো গভীর অর্থের প্রকাশ করে বলে ভাবতে পারি। এবং এখানেই আমরা Fillmore-এর case-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি ব্যাকরণে

ফিরে আসি। আমরা দেখছি যে, যা আমাদের ভাষা আরো ভাল বোঝার জন্যে উপযুক্ত নয়, তা নিয়ে কাজ করার লাভ নেই। কিন্তু Fillmore-এর শব্দার্থিক নিয়ম অন্যদিকে আমাদের কাজে লাগতে পারে। Fillmore যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন তা শব্দার্থের একটা গভীর স্তর, যেখানে ক্রিয়াপদের আসল চরিত্র প্রকাশ করা হয়। মনে করুন, প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদের নির্দিষ্ট একটা পরিবেশ আছে, যেখানে ক্রিয়াপদের বিশেষ্য প্রতিবেশী থাকে, আর ক্রিয়াপদ তার দরকার মতো বিশেষ্যকে বেছে নেয়। Fillmore এই পরিবেশকে বলছেন case frame। কিছু গভীর অর্থপূর্ণ case আবশ্যিক, কিছু আবার ঐচ্ছিক।

Fillmore-এর তালিকা এরকমঃ কর্তা (agent), অভিজ্ঞতাবাদি (experiencer), কর্ম (object), নিমিত্ত (recipient), করণ (instrument, পাত্র, যা দিয়ে কাজ করা হয়), অধিকরণ (location) আর উৎপত্তি (eorigin)।

কিভাবে গভীর এই স্তরটি ইংরেজি ভাষায় Active-Passive ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, তা একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো হলোঃ

(vi) Jack eat the apple (জ্যাক আপেলটি খেয়েছিল।) (Active)

(vii) The apple was eaten (আপেলটি খাওয়া হয়েছিল।) (Passive)

আপাত দৃষ্টিতে আপেলের বাহ্যিক পরিবর্তন হলো। ইংরেজিতে active বাক্যের কর্ম (আপেলটি) passive বাক্যের কর্তা হয়ে যায়, তবে ক্রিয়া খাওয়া/eat এবং কর্মের (আপেল) মধ্যকার যৌক্তিক সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হয় না। বাংলাতে এই পরিবর্তনটা হয় না—বাংলায় কর্ম কর্মই থাকে। কিন্তু ইংরেজিতে হলো। 'খাওয়া' ও 'আপেল'-এর মধ্যে আসল সম্পর্কটা বোঝার জন্য আমাদের শুধু জানা দরকার যে, খাওয়া ক্রিয়ার জন্য একজন জীবিত কর্তা (agent), যার ক্ষুধা লেগেছে, আর একটা ভক্ষণী কর্ম (object) প্রয়োজন। Fillmore-এর deep case-এর বর্ণনা বিবেচনা করে আমরা কারক বিশ্লেষণের সঙ্গে এর সাদৃশ্য টের পাই।

তাছাড়া, আমরা বুঝতে পারি—বাংলা ভাষার কারকের বিষয়টি চিন্তা করতে গেলে এই রকম নতুন পরিপ্রেক্ষিত কত উপকারী। এই পরিপ্রেক্ষিতের আর একটা প্রয়োগ হলো পবিত্র সরকারের বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেন– বাংলা ভাষার শুধুমাত্র কর্ম কারক আছে, সম্প্রদান কারক নেই। কথাটা আমার কাছে অস্বস্তিকর লেগেছিল। কিন্তু এই পর্যন্ত আমি ঠিক বলতে পারি নি—অস্বস্তিটা কিসের। এইবার Fillmore-এর deep case-এর সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি যে, বাংলা ভাষার সম্প্রদান আর কর্ম কারকের একটি মাত্র বিশেষ্য বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও সম্প্রদানের নিমিত্ত ভূমিকা আর কর্মের বস্তু (object) দুইটা একেবারে আলাদা জিনিস। সম্প্রদান আর কর্মের মধ্যে পার্থক্যটা শব্দার্থের স্তরে রয়েছে। I see him (আমি তাকে দেখি) আর I help him (আমি তাকে সাহায্য করি)—এদের মধ্যকার

পার্থক্যের উপর আমার বালিকাসুলভ মানসিকতা—সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ছিলো না। বাংলা ভাষার কর্ম কারক সম্প্রদানকে একেবারে গিলে ফেলার পরিবর্তে আমরা হয়তো বলতে পারি যে—*কে* বিভক্তিটা দুইটা কারকের কাজ।

এই গভীর শব্দার্থিক স্তরের একটি নতুন দিক থেকে আমরা বাংলা ভাষার গঠন নিয়ে কিছু নিরীক্ষা করতে পারি, যেমনঃ

-এ, -তে বিভক্তি আর 'দিয়ে' অনুসর্গ উভয়ে করণ কারক (instrumental) প্রকাশ করেঃ

(viii) আমরা হাতে ভাত খাই।
We (nom) hand (loc) rice eat (1st pps, simple pres)
We eat with our hands.

(ix) আমরা হাত দিয়ে ভাত খাই।
We (nom) hand with (pp) rice eat (1st pp, simple pres)
We eat with our hands.

-কে বিভক্তি আর 'জন্য' অনুসর্গ উভয়ে নিমিত্ত (beneficiary) প্রকাশ করেঃ

(x) আমাকে একটু পানি দাও।
I (obj) a little bit water give (imperative)
এরা সব a little bit of water.

(xi) আমার জন্য একটু পানি আনো।
For me a little bit water bring (imperative)
Bring some water for me.

-এ, -তে বিভক্তি আর 'ভিতরে'-এর মতো অনুসর্গ উভয় দ্বারা অধিকরণ কারক প্রকাশ করেঃ

(xii) মা ঘরে।
Mother (nom) house (loc)
Mother is in the house.

(xiii) মা ঘরের ভিতর।
Mother house (gen) inside (pp)
Mother is in the house.

শূন্য বিভক্তি, -র, -এর বিভক্তি আর -কে বিভক্তি, এগুলো কর্তা কারক (agent) প্রকাশ করে। এখানে আমরা এই প্রয়োগের একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় চলে এসেছি।

(xiv) আমি কালকে যাব।
I tommorw go (1st ps future)
I will go tomorrow.

(xv) আমার কালকে যাওয়া হবে।
of me tomorrow go (vn) be (3rd ps future)
I will go tomorrow.

(xvi) আমাকে কালকে যেতে হবে।
to me tomorrow go (inf) be (3rd ps future)
I will have to go tomorrow.

আমরা এখন দেখছি যে, এই নতুন শব্দার্থিক নিয়মটি বাংলা ভাষার বাক্যগঠনের কত সমস্যা সমাধান করতে পারবে। বাংলা ভাষার অনেক রকম বাক্য আছে—যেখানে nominative কর্তা নাও থাকতে পারে। অনেক বাক্যের মধ্যে জীবিত কর্তা (agent) থাকে না। তার পরিবর্তে যা আমরা উদ্দেশ্যের জায়গায় বসাতে চাই, তা হচ্ছে—সম্বন্ধ কারক। আমাদের সবচেয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি (যেমন– লজ্জা, ভয়, আনন্দ, রাগ) আমরা বাক্যের মধ্যে 'আমি' দিয়ে শুরু করি না, 'আমরা' দিয়ে শুরু করি। পূর্বে আলোচিত (iii-v) নম্বর বাক্যগুলো আর একবার দেখুন। এই বাক্যগুলোর 'আমার', 'আমার', আর 'তার' কি বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না? এই নতুন নিয়ম অনুসরণ করলে এসব চিন্তা শেষ হয়ে যায়। আমরা যখন বিভক্তি ব্যাপারটা একটু দূরে রাখতে পারি, তখন অনেক নতুন চিন্তার পদ্ধতি হাজির হয়ে উঠবে।

আমরা বাংলা ভাষা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা নিয়ে অনেক বছর ধরে আলোচনা করছি—এই রকম বাক্য, যেখানে nominative subject নেই, কি করে বিশ্লেষণ করা যায়। এবার একটা উপায় পাওয়া গেছে। ক্রিয়াপদটি agent অথবা experiencer বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নেয়। আর এই বেছে নেওয়াটা আমাদের আগের বিশ্লেষণের চেয়ে একটা আরো গভীর স্তরে ঘটে। এইবার আমাদের বিশ্লেষণের স্তরগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক।

স্তর	ব্যাকরণের ক্ষেত্র	সংজ্ঞা	অংশগুলি
১	ধ্বনি বিজ্ঞান		-এ আর -তে এই দুটির বিভাজন ও ব্যবহার
২	রূপতত্ত্ব	১	বিভক্তি
৩	বাক্যগঠন	২	ক্রিয়াপদের প্রয়োজনে (valency)
৪	শব্দার্থ বিদ্যা	৩	গভীর কারক

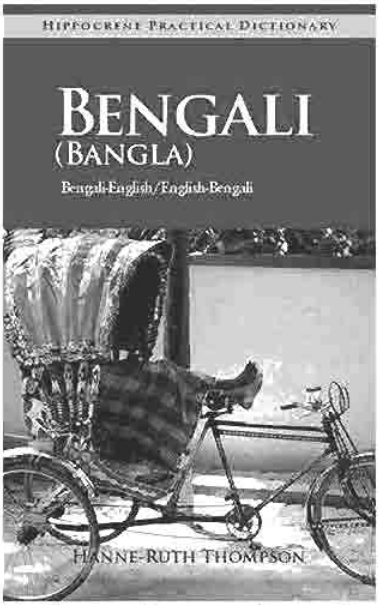

ইংরেজি ভাষায় রচিত হান্না-রুথ ঠম্পসন রচিত বাংলা-ইংরেজি/ইংরেজি-বাংলা অভিধান গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র

হান্না-রুথ ঠম্পসন

আমাদের ধারণা, এই বিশ্লেষণের সাহায্যে আরো অনেক বিষয় এখন বিবেচনা করা যাবে। বিবেচনা করতে হবে—কিভাবে বাংলা ভাষার গঠন, পরিবর্তনশীলতার ধারণা, কর্তার অবস্থান এবং পদবিন্যাস ও শব্দার্থবিদ্যার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আমাদের চিন্তাধারাকে বদলে দেয়।

আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের হঠাৎ করে একটা চমৎকার জাদুবল দেওয়া হয় নি; বরং আমরা নতুন এক বিশ্লেষণের পদ্ধতি পেয়েছি, যা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। এখান থেকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা আর প্রয়োগ পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এতে কোনো সরল উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু নতুন এক পথের সন্ধান এবং নতুন প্রশ্নের জন্ম দেবে।

এই সকল পথ অনুসরণ করে আর বিশ্বস্তভাবে আমাদের কাজ চালিয়ে গিয়ে আমরা হয়তো একটা নতুন ধরনের 'সত্যান্বেষণ' করতে পারি, আর মাঝেমধ্যে পাণিনির জাদুর কিছু উষ্ণতা অনুভব করতে পারি।

তথ্য নির্দেশ

[১] Thieme, Paul: "Meaning and form of the 'grammar' of Panini", paper presented before the Kuppusvami Research Institute (Madras), December 1973, published in: Keine Schriften, Franz SteinerVerlag, Stuttgart 1995

[২] Fillmore, Charles: *Toward a modern theory of case* (1968), p 21

[৩] মনির, শাহজাহান, *বাংলা ব্যাকরণ*, প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক, ঢাকা, ১০ সংস্করণ ২০০০

[৪] Dash, Achyutananda, Karaka Definitions—Revisitedin: *Indian traditions in linguistics,* Delhi, Pratibha Publishers 1993

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি

Dash, Achyutananda, Karaka Definitions- Revisitedin: *Indian traditions in linguistics,* Delhi, Pratibha Publishers 1993

Fillmore, Charles: *Toward a modern theory of case,* 1968

Thieme, Paul: "Meaning and form of the 'grammar' of Panini", paper presented before the Kuppusvami Research Institute (Madras), December 1973, published in: Keine Schriften, Franz SteinerVerlag, Stuttgart 1995

Trask, R. L., *A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics*, 1993

বাংলা

আজাদ, হুমায়ুন, *বাক্যতত্ত্ব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪

মনির, শাহজাহান, *বাংলা ব্যাকরণ*, প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক, ঢাকা, ১০ সংস্করণ ২০০০

রায়, হরলাল, *ব্যাকরণ ও রচনা*, পুঁথিঘর, ঢাকা, ১৯৬২

সরকার, পবিত্র, *পকেট বাংলা ব্যাকরণ*, পাঞ্জেরী, ঢাকা, ২০১৩

প্রবন্ধটি ইংরেজিতে "পাণিনি'স ম্যাজিক—ট্রুয়ার্ডস এ ক্লিয়ার পিকচার অব দি বেঙ্গলি কেস সিস্টেম" শিরোনামে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে টি মিডিয়া পাবলিকেশন (কলিকাতা) থেকে নীলাদ্রি শেখর দাস, প্রবাল দাসগুপ্ত ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত রেইনবো অব লিঙ্গুস্টিকস-এর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত। বাংলা অনুবাদ করেছেন—খামিন। অনুবাদিত প্রবন্ধটি মূল-লেখক কর্তৃক সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত। সেই বিচারে দিয়ে এটি লেখকের মৌলিক বাংলা রচনা বলে উল্লেখ করা যায়।

খণ্ড ১, সংখ্যা ১ ভাবনগর আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 BHABNAGAR August 2014

রবীন্দ্র সাহিত্য ও চীন দেশ

দং ইউ চেন

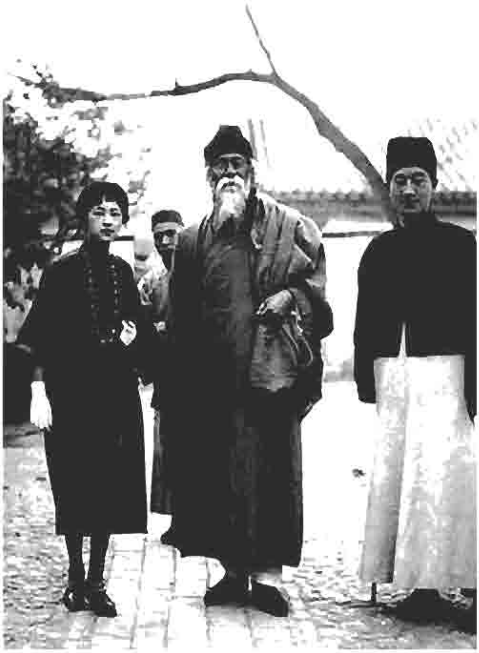

চীন সফরে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চীনের কবি সিউ সিমো এবং লিন হুইন-এর সাথে

The Literature of Rabindranath and China

Dang Yu Chen

Abstract

This article sheds some new light on the works of Rabindranath Tagore as well as their translations in China, giving a history of their transformations. Article deals with the different phases of translation of Tagore's compositions. While his translation were being done English, some translation were also done in Chinese language. The article discuses the different components deriving from the root Bangla language of these compositions. Alongside mentioning Rabindranath Tagore's travels in China, the article gives a summarized description of the Chinese poets and artists, publishers, political personalities, painters, dramatic actors, teachers and students, and members of the general public who celebrated Rabindranath's work. Several examples are also mentioned of the works that they produced in memory of Rabindranath's journeys, alongside his own literary creations. Finally, the article gives an analysis with examples of how Rabindranath Tagore's inspired writings—novels, stories and observations—influenced modern Chinese history.

প্রাথমিকভাবে চীনা পাঠকেরা রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয় করেছিলেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর সময় থেকে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তারপর তিনি পৃথিবীতে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আসলে, এই সময় থেকে চীনদেশের সাহিত্যিকগণ রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি চীনা ভাষাতে অনুবাদ করতে শুরু করেন।

চীনদেশে সবচেয়ে আগে চীনা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক ছেন্ তু স্যু। তিনি *গীতাঞ্জলি*-র ইংরেজি সংস্করণের চারটি কবিতা চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে "যুবক" পত্রিকায় তা প্রকাশ করেছিলেন। এরপর কয়েকজন চীনা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি ইংরেজি ভাষা থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। থিয়াফেন এবং উয়াও দু'জন অনুবাদক প্রথমে গুরুদেবের *গল্পগুচ্ছ*-এর তিনটি গল্প চীনা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তাঁদের অনুবাদ ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন ও জুলাই মাসের "মহিলা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের অনূদিত গল্পগুলোর মধ্যে ছিল– কাবুলিওয়ালা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

তারপর চীনা লেখকগণের মধ্যে ঝেন জেন দ্যু (郑振铎), লিউ বাঁনোং (刘半侬), জিন মিং ইউয়ান (金明远), হুআং জেন সু (黄仲苏), ইয়ে শোজুন (叶绍钧), ছু শিইং (瞿世英), ওয়ান থোং জাও (王统照) *রবীন্দ্র-রচনাবলী* অনুবাদ করেছিলেন। বিশেষত ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে গুরুদেব চীনদেশে আসার আগে, চীনদেশে তাঁর রচনাবলী অনুবাদ ও গবেষণা করার খুব উৎসাহী হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে শাংহাই থাইদং প্রকাশনালয় রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ* প্রকাশিত করেছিল। এই বই-র মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। ছ'টি গল্প : 'পোস্টমাস্টার', 'ঘাটের কথা', 'প্রবেসিনী', 'নিশীথে' ইত্যাদি। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে শাংহাই বাণিজ্য প্রকাশিনালয় রবীন্দ্র-গল্পগুলি প্রকাশিত করেছিল। তার মধ্যে আছে চারটি গল্প : 'কঙ্কাল', 'মাসি' ইত্যাদি।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে শাংহাই চীনা প্রকাশন হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সুনির্বাচিত রবীন্দ্র-উপন্যাস-গল্প। তার মধ্যে রয়েছে নয়টি গল্প, একটি উপন্যাস

ওয়ান থোং জাও

ঝেন জেন দ্যু

চতুরঙ্গ। অনুবাদক ছিলেন ভারতীয় চীনা ভাষাবিদ প্রমথ কুমার বাগচী, তিনি চীনা ভাষা খুব ভালো জানতেন এবং অনেক বছর শান্তিনিকেতনে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়ে চীনা সাহিত্যিকগণ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন এবং তাঁদের প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। যথাক্রমে—এক. ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে "প্রাচ্য" পত্রিকায় হু ইউজি-এর প্রবন্ধ "রবীন্দ্র ও প্রাচ্য : পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমালোচনা"; দুই. ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে "গল্প : মাসিক পত্রিকা"-তে প্রকাশিত হয়েছিল জানং ওয়েন থিয়াং-এর প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও তাঁর দর্শন-ধারা"; তিন. একই সময়ে ও একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল হু শি ইং-এর প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথের জীবন-দৃষ্টি ও বিশ্বদৃষ্টি" এবং ঝেন জেন দ্যু-এর দু'টো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল—যার একটি হলো "রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাচ্ছি", এবং দ্বিতীয়টি হলো "রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সৃষ্টি"।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১২ তারিখ থেকে মে মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা চীনদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তখন তিনি ও তাঁর বন্ধুরা শাংহাই, হাং ঝো, নাংজিং, জিনাং, বেইজিং, থাইয়ান্, উহাং—এই ৭টি শহরে ভ্রমণ করেন। সে সময় রবীন্দ্র যে শহরেই গিয়েছিলেন সেখানকার চীনা সাহিত্য জগতের মানুষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কবিগুরুকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছিলেন।

নতুন চীন দেশ সংগঠিত হবার পরে, অনেক বিশিষ্টজন রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলো অনুবাদ করেছিলেন। শিসুজো (石素真) ছাড়া তখন চীন দেশে বাংলা জানার

তেমন কোনো লোক ছিল না, এই জন্য তাঁরা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সাধারণত ইংরেজি ভাষা থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

শ্রীমতী শিসুজো নতুন চীন দেশের প্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদক। শিসুজো ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ১৩ তারিখে বেইজিং শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শিসুজো-র স্বামী উসিআওলিং বিশ্বভারতীর নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, তখন শিসুজো তাঁর স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। উসিআওলিং বিশ্বভারতীতে চীনা ভাষা ও সাহিত্য পড়াতেন। শিসুজো শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালে সেখানে চার বছর বাংলা পড়েন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে চীন দেশে ফিরে আসেন। চীনে ফিরে আসার পর তিনি প্রথমে বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগে কাজ করেন। আর তখনই তিনি বাংলা ভাষা পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু কোনো অজানা কারণে তাঁর পক্ষে সে সময় বাংলা ভাষা পড়ানো সম্ভব হয়নি। এরপর থেকে তিনি চীন দেশের একাডেমীতে বাংলা সাহিত্য গবেষণা কাজ করেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ শিসুজো প্রয়াত হন। আসলে, এই শিসুজো দেবী-ই বাংলা ভাষা থেকে চীনা ভাষায় বাংলা সাহিত্যের রচনাগুলো অনুবাদ করার প্রথম বিশেষজ্ঞ। তিনি বাংলা সাহিত্যের নানা রচনা অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর কবিতা—'কথা ও কাহিনী'; উপন্যাস—*চতুরঙ্গ;* নাটক—*মুক্তধারা;* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাস—*বিষবৃক্ষ*, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাস—*শ্রীকান্ত* (প্রথম অংশ) ইত্যাদি।

দুই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা-ভাষার মহান কবি। চীনা জনগণের মাঝে তিনি প্রিয়তম কবি ও মহান বন্ধু। চীনা পাঠকরা তাঁর সাহিত্য ভালবাসেন। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র অধিকাংশ চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম তাঁর সম্পূর্ণ লেখা নিয়ে রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে হেবেই শিক্ষা প্রকাশনালয় হতে। আসলে, এই চীনা অনুবাদ সম্পূর্ণ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* নয়, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র মধ্যে প্রবন্ধগুলির অর্ধেক অংশ অনুবাদিত হয় নি এবং নাটকগুলির অর্ধেক অংশ অনূদিত হয় নি। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে হুয়া-ওয়েন প্রকাশনালয় হতে। সৌভাগ্যবশত আমি এই প্রকাশনার কাজে অনুবাদ ও সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলাম। এই সমগ্র উপন্যাস ও গল্পের অনুবাদ হয়েছিল মূল বাংলা হতে, ইংরেজি ও হিন্দি হতে নয়। আনন্দের কথা, একই বছরে আমার লেখা *রবীন্দ্র-জীবনী* বহু ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে বেইজিং বিদেশী ভাষা শিক্ষাদান ও গবেষণা প্রকাশনালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশিত করেছে, মোট ছয়টি খণ্ডে। এই শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির নির্বাচন ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকায় আমি গর্ব অনুভব করি। পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ সুবিখ্যাত পণ্ডিত বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি শিয়েলিন এই বইগুলির নাম লিখেছেন।

তিন

এবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর চীন ভ্রমণ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল হংকং হয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা (পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু, কবির সেক্রেটারি এলমহার্স্ট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কালিদাস নাগ, আমেরিকান মেয়ে গ্রিন) চীনে যান।

তখন সান ইয়াট সেন অসুস্থ হয়ে চীনের গুয়াংচৌ শহরে বাস করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কবির দেখা হয় নি, তিনি কবিকে চিঠি লিখে গুয়াংচৌতে আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা ছিল সাংহাই ও বেইজিং যাবার, তার জন্যে কবি ও সান ইয়াট সেনের দেখা হয় নি।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল কবি ও তাঁর সঙ্গীরা শাংহাই পৌছান। তাঁদের স্বাগত জানান শাংহাই শহরের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক মানুষেরা। সুদূর বেইজিং হতে কবিকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন অধ্যাপক সিউ সিমো। উনি ইংল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও আধুনিক চেতনার যুবক। ১৪ এপ্রিল হতে ১৬ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত কবি ছিলেন হাংচৌতে; কবি ও তাঁর সাথীরা সিহু হ্রদের সৌন্দর্য ও বিখ্যাত লংজিং চায়ের স্বাদ উপভোগ করেন। তিনি ঝেজিয়াং প্রদেশের শিক্ষাভবনে ভাষণ দেন ও এই ঘটনা চীনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেক সাড়া ফেলে। ১৭ এপ্রিল তারিখে কবি শাংহাইতে যান। সেখানকার নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাঁকে ১৮ এপ্রিল তারিখে বাণিজ্যিক প্রকাশনালয়ের অতিথি-ভবনে স্বাগত জানান। সেখানে কবি-র বক্তৃতা খুব সাড়া জাগায়।

সান ইয়াট সেন

সিউ সিমো

লিয়াং ছি চাও

২০ এপ্রিল তারিখে তিনি নানজিং যান। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাথিরা মিংযুগের রাজা মিংসিয়াওলিন সমাধি দেখেন এবং তিনি বিকালে দক্ষিণ পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা দেন। একই তারিখে রাতের ট্রেনে তাঁরা উত্তর চীনের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

২২ এপ্রিল তারিখে তিনি সানতুং প্রদেশে যান। পরদিন সেখানে প্রাদেশিক সভাহলে বক্তৃতা দেন।

এবার কবি গেলেন চিনান শহর হতে বেইজিং। অগণিত ছাত্রছাত্রী, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও গুণীজন কবিকে বরণ করলেন। চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি ও বাজির শব্দ মুখরিত হল শহরে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাবলিক সম্বর্ধনা হল রাজকীয় উদ্যানে। অজস্র গুণীজনের সমাবেশে দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন লিয়াং ছি চাও। তিনি বলেন—"আমরা সাত-আট শত বছর পরস্পরকে ভালবাসিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়া স্নেহশীল ভাইয়ের মতো বাস করিয়াছিলাম; আমরা পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা চীনের মানুষেরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতীয়দের নেতৃত্বে পরিচালনার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।"

২৭ এপ্রিল কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা বেইজিং বাদশাহী প্রাসাদে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রাসাদ প্রাচীর দ্বারা পূর্ণবেষ্টিত; সিংহাসনচ্যুত সম্রাট পুয়ী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদেরকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে প্রাসাদের নানারূপ সামগ্রী দেখেন এবং দুপুরবেলা পুয়ী আয়োজিত ভোজ সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

২৮ এপ্রিল ধরিত্রী-মন্দিরের প্রাঙ্গণে কবি বেইজিং-এর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ এক ভাষণ দান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষণে বলেন—

"য়ুরোপ এশিয়াকে অভিভূত করেছে। য়ুরোপের প্রতি আমরা অন্যায় করেছি—আমরা তাহাদের সহিত সমকক্ষভাবে মিলিতে পারি নাই। ইহার ফলে মিলন হইল শক্তিমান ও শক্তিহীনের মধ্যে ... একপক্ষ হইতে অপমান, অপর পক্ষ হইতে দাস্যভাব।"

২৯ এপ্রিল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার সঙ্গীরা একটি চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি চীনা চিত্রকারদের মধ্যে সিউ বেই হং (徐悲鸿), ছি বাইশি (齐白石), ছেন বান্ তিন (陈半丁), ইআও মাংফু (姚茫父) প্রমুখের সাথে কবি দেখা করেন।

১লা মে মাসে কবি ছিংহুআ বিশ্ববিদালয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

চীনা চিত্রশিল্পী হি বাইশি

চীনা চিত্রশিল্পী সিউ বেই হং

৭ই মে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৪তম জন্মদিন। তাই ৮ই মে তারিখ রাতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে একটি অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সভায় লিয়াং ছি চাও কবি রবীন্দ্রনাথকে চীনা নাম দেন—'জ্যু ঝোন্ দান্'। জ্যু শব্দটি—'তিয়ান্ জ্যু' থেকে নেওয়া হয়েছিল। 'তিয়ান্ জ্যু' হলো–পুরানো চীনা ভাষায় ভারতের নাম। 'ঝোন্ দান' শব্দটি—China থেকে অঠিক অনুবাদ। চীনা শব্দটি 'দান্'-এর মানে সূর্য উঠে—এই শব্দটি রীন্দ্রনাথের মধ্যে রবির সঙ্গে সংযোজিত হয়। কবি সেদিন চীনা পোশাক পরেছিলেন এবং প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন। সেদিন রাতে রবীন্দ্রনাথের নাটক *চিত্রাঙ্গদা* অভিনীত হয়। এই জন্মদিনের সভার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল মনে রেখেছিলেন। কেননা, আমরা দেখি তিনি ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতায় তিনি চীন দেশে তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপনের কথা লিখেছেন এভাবে—

নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চীনদেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' ব'লে।
খসর পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ,
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ;
অভাবিত পরিচয়ে

আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চীনের নাম, পরিনু চীনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।
বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে-
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা। [জন্মদিনে : ৩ সংখ্যক কবিতা]

৯ই মে তারিখ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীন দেশে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন। এই দিন সকালেই তিনি তিনবার বক্তৃতা দেন।

১৯ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদের জন্য চীনা বেইজিং অপেরার বিখ্যাত শিল্পী মেই লান্ ফাং বেইজিং অপেরাতে 'লুও নদীর দেবী'-র অভিনয় উপস্থাপন করেন।

২০ মে তারিখে লিয়াং ছি চাও, মেই লান্ ফাং, ইয়াও মাংফু প্রমুখ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদেরকে ভোজে আমন্ত্রণ করেন। খাবার সময়ে কবি বলেন—'অপেরা খুব ভাল।'

লিয়াং ছি চাও কবিকে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি এবার কি লিখবেন?"

কবিগুরু বলেন যে, তিনি এইবার চীনদেশের যাত্রা নিয়ে লেখার কথা ভাবছেন। তারপর তিনি মেই লান্ ফাং-এর একটা খাতায় একটি কবিতা লেখেন–

অজানা ভাষা দিয়ে
পড়েছো ঢাকা তুমি, চিনিতে নারি প্রিয়ে।
কুহেলী আছে ঘিরি,
মেঘের মতো তাই দেখিতে হয় গিরি।

মেই লান্ ফাং

এই রাতের ১১টায় রবীন্দ্রনাথ সদলে বেইজিং থেকে থাই-ইউআনের দিকে যান, পরদিন সকালে শানশি প্রদেশের রাজধানীতে পৌঁছান। কবি ও তাঁর সঙ্গীরা থাই-ইউআনে তিনদিন ছিলেন। ওখানে তিনি শানসি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দান করেন। পঁচিশে মে কবি সদলে উহান শহরে যান, পরদিন কবিগুরু বক্তৃতা দেন।

২৮ মে তাঁরা শাংহাইতে ফিরে যান। এরপর ৩০ মে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা শাংহাই থেকে জাপানে যান।

রবীন্দ্রনাথ সদলে চীনদেশের সাতটি শহরে ভ্রমণ করেন। সব মিলিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একনাগাড়ে চীন দেশে ৫০ দিন অবস্থান করেন।

১৯৫৭ সালে চীনদেশের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারত ভ্রমণে এসে শান্তিনিকেতনে যান। তিনি বলেন, "coming to this centre of learning of India, one si bound to think first of the founder of this University, India`s great patriotic port Rabindranath Tagore .He is a talented poet who made outstanding conteibutions to woeld literatures. He is furthermore a distinguished representative of the great Indian people, who loathe darkness and seek light. The Chinese people cherish a profound feeling for Tagore, the Chinese people can never forget Tagore`s affection for them. nor can they forget the support, which Tagore gave them for their hard struggle for national independence. Till now, the Chinese people have the best memory of Tagore`s visit to China in 1924… Tagore is the pride of the Indian people, and the Visva-bharati .

1957年1月周恩来在访问印度泰戈尔国际大学时所说的一番话，对于泰戈尔1924年的中国之行做出了公正的评价，他说æ：泰戈尔不仅是对世界文学做出卓越贡献的天才诗人，还是憎恨黑暗、争取光明的伟大印度人民的杰出代表。中国人民永远不能忘记泰戈尔对他们的热爱。中国人民也不能忘记泰戈尔对他们的艰苦的民族独立斗争所给予的支持。至今，中国人民还以怀念的心情回忆着1924年泰戈尔到中国的访问。泰戈尔是印度人民的骄傲, 也是国际大学的骄傲。"

চার

এখন চীনা আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রভাব প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক। চীনা আধুনিক সাহিত্যের বিকাশে রবীন্দ্রনাথের খুব প্রভাব পড়েছিল, বিশেষত তাঁর কবিতা নতুন চীন দেশের কবিতার বিকাশেও প্রভাব ফেলে। তখন চীনা যুবক-যুবতী লেখক-কবিরা যা রচনা করতেন, তা একটু গভীরভাবে পাঠ করলেই বোঝা যায়—তাঁদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের কত বিরাট প্রভাব পড়েছিল।

চীনের বিখ্যাত লেখক গুও মোড়ো বলেছিলেন যে, যখন তাঁর চিন্তাধারা কাতর হয়েছিল, তখন তাঁর চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রভাব পড়েছিল। আসলে, রচনা সৃষ্টির দিক থেকে তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গ্রহণ করেছিলেন। গুও মোড়ো-এর লম্বা কাব্য "দেবী" রচনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। এখানে তাঁর একটা ছোটো কবিতার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

গুও মোড়ো

চৌ এন লাই

আমার একটি ছুরি আছে,
সে জানালায় থেকে আমার দিকে তাকিয়ে দেখে হাসে।
সে আমাকে হেসে বলে– মোড়ো, দুঃখিত হয়ো না !
তুমি আমার সঙ্গে চুমু খেতে শীঘ্রই আসো,
আমি তোমার সব দুঃখ ধ্বংস করবো।
জানালার বাইরে সাগরের নীল জল
আমাকে অবিরত ভাবে ডাকছে।
সে আমাকে চেঁচিয়ে বলে– মোড়ো, তুমি দুঃখিত হয়ো না !
তুমি আমার বুকে শীঘ্রই আসো,
আমি তোমার সব দুঃখ ধ্বংস করবো।
(一)

我有一把小刀 (উঃ ইয়উ ই বা সিয়াও দাও),
依在窗边看我笑 (ই ঝাঁই ঝউঃ বিয়ান কান উঃ হিয়াও)
她向我笑道: 沫若, 你别心焦 (থা হিয়াং উঃ হিয়াও দাও মোড়ো নি বিয়ে হিন জিয়াও)।
你快来亲我的嘴 (নি কুয়াই লাই ছিন উঃ দে ঝু),
我好替你除去很多烦恼 (উঃ হাও থি নি ঝুছু ফাং নাও)。
(二)

窗外的青青的海水(ঝু উয়াই দে ছিঃছিঃ দে হাই শুই),
不住声地也向我叫号(বু ঝু শেন দে জিয়াও হাও)।
她向我叫道: 沫若, 你别用心焦 (থা হিয়ান উঃ জিয়াও দাও মোড়ো, নি বিয়ে ইয়েন হিন জিয়াও)!
你快来入我的怀儿(নি কুয়াই লাই ডু উঃ বাও),
我好替你除却许多烦恼(উঃ হাও থি নি ঝু ঝুএ সিউ দুও ফাং নাও)।

চীন দেশের আরেকজন মহান লেখিকা হলেন—শিয় বিংসিং। যৌবকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভালবাসতেন। তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণভাবে বলেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার সুন্দর কবিতাগুলি আমার প্রায় জন্মকাল হতে প্রাপ্ত কাতর-হৃদয়কে শান্তি দিয়েছিল। আপনি আপনার দার্শনিক চিন্তাধারা দিয়ে আমার হৃদয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন।" তিনি বলেছিলেন—"আমি যখন আমার কবিতা 'তারাগুলি' ও 'বসন্ত জল' লিখেছিলাম, সেই সময় আমি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পেয়েছিলাম। আমি শুধু ছোটো কবিতাগুলি লিখেছিলাম।" উদাহরণ হিসেবে এখানে শিয় বিংসিং-এর লেখা "তারাগুলি" নামের কবিতাবলীর একটা উদ্ধৃত করা যাক—

দুর্বল ও ক্ষীণ তৃণ !
তুমি গর্ব হও,
শুধু তুমি সমস্ত পৃথিবীকে সজ্জিত করছ।

শিয় বিংসিং

(《繁星》(ফাং সিং)
弱的小草呵! (ডুও দে সিয়াও ঝাও আ)
骄傲些罢 (জাও আও হিয়ে বা)
只有你普遍的装点了世界。(জী ইউ নি ভুবিয়ান জুয়ান দিয়ান লে শিজে)

এবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর "পরিচয়" নামের কবিতার কথা মনে করতে পারি, এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"দয়া বলে, কে গো তুমি মুখে নাই কথা?
অশ্রুভরা আঁখি বলে, আমি কৃতজ্ঞতা।"

দুই কবি-র দুটি কবিতার উদ্ধৃতি দেখে অনুভব করা যায়—দুটি কবিতার রচনা-শৈলী প্রায় একই রকম। আসলে, রবীন্দ্রনাথ ও শিয় বিংসিং দু'জনার ছোটো কবিতাতেই গভীর ভাবধারা প্রকাশ করেছে।

উপরোক্ত দুই চীনা লেখক ছাড়াও তখনকার অন্যান্য চীনা ভাষার লেখকদের মধ্যে ছুজিছিং, জেং জেন্ দুও, ওয়ান্ থেং জাও, ইয়ে শেং থাও, শু শাও উই প্রমুখ এই ধরনের কবিতা লিখেছিলেন। তখনকার বড়ো বড়ো পত্রিকা "ছেন্ বাও" (প্রভাত-পত্রিকা), "শ্যিদেন্"(শিক্ষা-দীপ), "জাওউ" (জাগরণ) ইত্যাদিতে সব সময় এই ধরনের কবিতাগুলি প্রকাশ করত। তাই এই ধরনের ছোটো কবিতা চীনা আধুনিক সাহিত্যে একটি জনপ্রিয় স্থান দখল করে।

চীনের লেখক, কবি ও অধ্যাপকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীনা ভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক দং ইউ চেন তাঁর বামপাশে পিকিং ইউনিভার্সিটির বাংলার অধ্যাপক চাং সিং

কবিতা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং গল্প চীনা উপন্যাস ও গল্প রচনার উপরে বিরাট প্রভাব ফেলে। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস গল্পগুচ্ছের মধ্যে একটি প্রধান-সূত্র আছে :

"দুর্ভাগ্য জনগণের প্রতি মানবিক ভালবাসা।"

তাঁর উপন্যাস *নৌকাডুবি*-র নায়ক রমেশ এই ধরনের ভালবাসার প্রতিনিধি। এই প্রধান-সূত্র চীনা কথা-সাহিত্যের উপর বেশ প্রভাব ফেলে। চীনের লেখক শিয়ে বিংসিং-এর উপন্যাস *শরৎ বাতাস ও শরৎ বৃষ্টি লোকজনকে দুঃখ নিয়ে আসে* (秋风秋水秋杀人), চীনের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ইয়ে শেংথাও-এর উপন্যাস *আফেং* (阿凤, ওয়ান থোং জাও-এর উপন্যাস *ঈষৎহাসি* (微笑) ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস থেকে প্রভাব গ্রহণ করেছিল।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, চীনা আধুনিক সাহিত্যে বহুদিকের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহান বিশ্বকবি হিসেবে সুন্দর রচনাগুলি লিখেছিলেন। তিনি সুহৃদয় মানুষ, সততাপূর্ণ লেখক। রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি পড়ে চীনা পাঠকরা জানেন, রবীন্দ্রনাথের দয়া ও উদারতা চিরদিন চীন দেশের লোকের মনে দাগ রেখে যায়। এই জন্য চীনা পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর রচনা আজও অত্যন্ত প্রিয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রতি চীনা পাঠকদের এখনও রয়েছে গভীর ভালবাসা। চীনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মিডেল স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর বই পড়তে ভালবাসেন—এই তথ্যগুলো হয়তো বাংলা ভাষা-ভাষী অধিকাংশ মানুষের কাছেই অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু চীন দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর সাহিত্যকর্মের গ্রহণযোগ্যতা একদিকে সাহিত্য জগতে রয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ পাঠক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমানভাবে গৃহীত।

খণ্ড ১, সংখ্যা ১ ভাবনগর আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 BHABNAGAR May 2014

আগে জান না রে মন

ইংরেজি অনুবাদে লালনের গান

কিথ ই. কান্তু

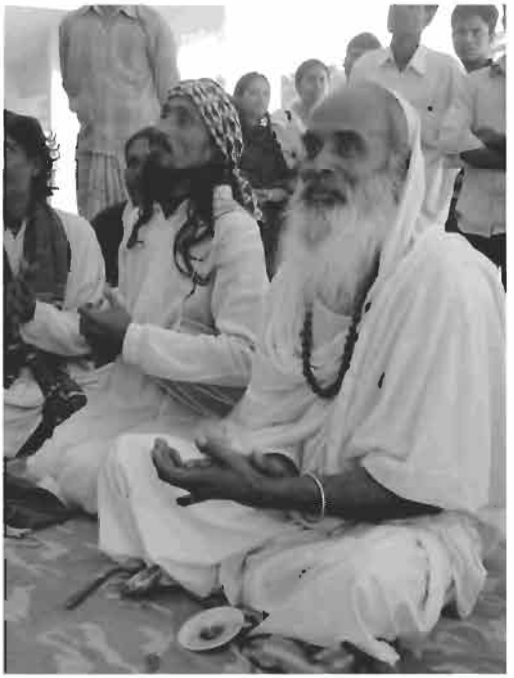

বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালনপন্থীদের সংগীতসঙ্গ

Oh my heart had you only known

Lalan Songs in Einglish

Keith E. Cantú

Translations

Abstract

The songs of Bangladesh's revered bhāb-sādhaka Lalan Sain have been translated by many different scholars at different times. Often their translations, however, have been primarily designed for literary appreciation or academic analysis. The translations that are found in this article, while they certainly aim to be useful in other contexts, are more directly intended to communicate the spiritual essence of the music and make the various archetypal and linguistic symbols found in Lalan's lyrics come alive for non-native speakers of Bangla. They are also designed to be set to music, and as such have been recently performed with their original Baul melodic scales and instruments by singers in Kushtia, Narsingdi, Dhaka, and elsewhere. To this end, a slightly different perspective has been taken in formatting and word-choice. In the introduction to the translations a brief narrative summarizes how the translator, originally brought up near the border between Mexico and the United States, became initially fascinated both by Bangladesh's sādhana subculture and the songs of Lalan. It then briefly describes his acquaintance and association with the bards or folk singers and followers of Lalan songs, especially those who claim to observe the original or ādi Baul modes of life as passed down through songs and oral tradition, and touches upon his experience in their wider Bangla musical milieu, including both in the more formal sādhu-sanga or community of aspirants and in more casual contexts, both urban and rural. The article closes with a publication of five English translations of Lalan songs, alongside with the original Bangla lyrics as received orally from well-respected Bauls in the Lalan tradition

লালন সাঁই বাংলাদেশের ভাবসাধক শিরোমণি। তাঁর সাধনার ধারা ও গানের সুর-বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই প্রবন্ধে লালন সাঁইজি চিন্তা-দর্শন ও সাধনার সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার আধ্যাত্মিক ভাব-সাধনার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে চেষ্টা করছি। এই আলোচনার প্রথমে অনুবাদক হিসেবে একজন ম্যাক্সিকান-আমেরিকান কীভাবে লালন সাঁইজির গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি—সে কথা যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একই সঙ্গে লালনপন্থীদের জীবনাচার, খাদ্যাভাস, সাধুসঙ্গ, সংগীত পরিবেশনার রীতি, ভাবসাধনা ইত্যাদি বিষয়েও কিছু তথ্য প্রদান করছি। তারপর ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার সাধক সম্প্রদায়—তথা O.T.O (Ordo Templi Orientis) আর A∴ A∴ "ম্যাজিক" অনুসারীদের রচিত গ্রন্থ' রচনা বিষয়ে এবং আরবি ও হিব্রু ভাষার অক্ষরমালার মধ্যে প্রতীকায়িত ভাবে যোগ-সাধনার যে মর্মকথা প্রচলিত রয়েছে, তার সাথে লালন সাঁইজির গানের বাণীর অন্তর্ভুক্ত বর্ণমালা ও শব্দের পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করছি।

এক

তিন বছর আগে, অর্থাৎ ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে Fulbright Fellowship পেয়ে বাংলাদেশে এসে ঢাকার ধানমণ্ডিতে একটা আলোকচিত্র প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ঢাকার অন্যতম আলোকচিত্রী জাইদ ইসলাম আমার সাথে পরিচিত হন, একই অনুষ্ঠানে আরেকজনকে আমি ভিড় থেকে হঠাৎ দেখি। তার পোশাক একদম সাদা, কিন্তু তার কালো চক্ষু রহস্যের মতো বিরাজ করে। তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম–

"আপনার নাম কি?"

"বিধান"।

"কি করেন আপনি?"

আমার কথা শুনি তিনি বললেন–

"আমি তো লালন গীতি গাই, শাহবাগে গেলে সব জানতে পারবেন।"

এ কথা শুনে আমার আগ্রহ বেশ বেড়ে গেল। আমি ওই সপ্তাহে শাহবাগে চারুকলার সামনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছবির হাটে যাই। সেখানে সবুজ ঘাষের উপর বসে নিরিবিলিভাবে অনেক সময় কাটলো। তারপর আমার কাছে বসে বিধান আস্তে আস্তে একতারা ও ডুগি বাজাতে শুরু করল। ওই মূহুর্তে আমার মধ্যে অনেক শক্তির অনুভব তৈরি হলো। আমি ভাবছিলাম যে, আরো শিখতে হবে আর জানতে হবে। কিন্তু কিভাবে? আমার 'অন্তর-গুরু' মনের ভিতরে থেকে জবাব দিলো—"সাধনা করতে হবে। না হলে কিছুই হবে না।"

দিনে দিনে তাই আমার বাউল-মন ভাব সাগরে ডুব দিলো। ওই বছর (২০১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দে) আমি কুষ্টিয়া নরসিংদী ও মেহেরপুরে গিয়ে সাধুসঙ্গের মধ্যে থাকতে শুরু করি। কুষ্টিয়ায় লালন শাহ আখড়া বাড়িতে গিয়ে বিধানের সাথে অনেক জ্ঞানী-পরিবেশে যেতে পেরেছি।

নরসিংদীতে গিয়ে আমার বাউল-গুরু হুমায়ূন সাধুকে পেয়ে তাঁর আখড়াতেও থাকতাম। তাঁর সাথে নারায়ণগঞ্জ-এর বন্দরে গিয়ে ফকিরি-পরিবেশে বসে বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতি সম্পর্কে আরো ভাল বুঝতে পারি।

বিধান শাহ (হুমায়ূন সাধুর শিষ্য) আমাকে অনেক জায়গায় বাউল জগতে নিয়ে গিয়েছে। এইরকমের ভ্রমণে আমাদের কাছে জিনিসপত্র অনেক কম থাকত।

ডুগি (বায়া) ও গুপীযন্ত্র (একতারা) বাজিয়ে লালন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন কিথ কাস্ত পাশে ধ্যান যোগে প্রেমজুড়ি বাদনরত ম্যাডেলিন বেকের

আসলে, শুধু বাদ্যযন্ত্র, সিদ্ধি-সেবার জিনিস ও ছোটো নোকিয়া মোবাইল ছাড়া তেমন কিছু আমাদের থাকত সঙ্গে থাকতো না। তবে, আসন করার জন্য কয়েকটা গামছা থাকতো আমাদের সঙ্গে। বিশেষ করে লোকনাথ শ্মশান ঘাট, লেংটা বাবার মেলা, কুমিল্লার কাছে, ধানমণ্ডি ২৭-এর দিলু ভাইয়ের লালন সংসদ ভ্রমণ আমার কাছে উজ্জ্বল স্মৃতির অংশ; প্রত্যেক পরিবেশে সারা রাত জেগে প্রচুর গান গেয়েছি এবং সাঁইজীর জ্ঞানের উপর কথা বলে সময় পার করেছি।

আসলে, আমার মন তো সেই ছোটবেলা থেকে সাধনার দিকে চলমান। কেননা, আমার বাবা একজন খ্রিস্টান পুরোহিত ছিলেন, আর আমার মা একই ধার্মিক পথে যান। বাবা-মায়ের সাধনার পথ দেখে, আস্তে আস্তে আমার নিজের মনে কিছু প্রশ্ন জেগে উঠেছে, যেমন—"গড আসলে কে?" অথবা "অন্য ধর্মের মধ্যে কি কি জ্ঞান আছে?" ইত্যাদি। এই সাধারণ প্রশ্ন থেকে আমি উত্তর খুঁজতে শুরু করি।

তিন

ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগ-সাধনার কথা আছে—তার নিজস্ব একটা নামও আছে, যার ইংরেজি হলো—"ম্যাজিক"। দুইটা আন্তর্জাতিক Initiatory Orders বা সাধক-সম্প্রদায় আছে—O.T.O. (Ordo Templi Orientis) আর A.·. A.·.। তাদের জ্ঞানেও 'মনের মানুষ'-এর কথা আছে।

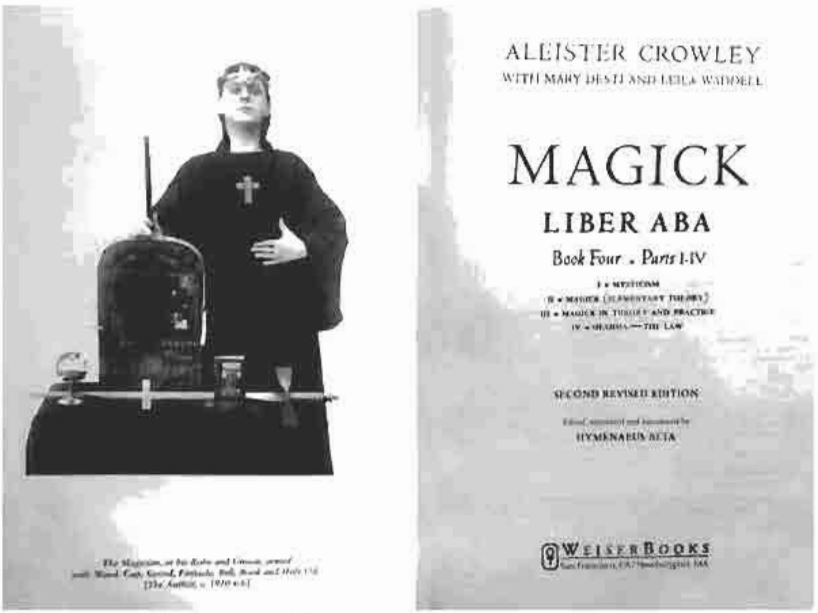

যুক্তরাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক সাধনার বইয়ের আখ্যাপত্র এবং একজন যোগ সাধিকা সাধনার ভঙ্গি

তার মানে তারা বলে যে, একজন 'মনের মানুষ' অথবা উচ্চ-চৈতন্য আমাদের দেহের ভিতরেই বিরাজ করে। এ 'মনের মানুষে'র নাম তাদের সাধু ভাষায় হল "Holy Guardian Angel"। সেই Angel অথবা 'মনের মানুষ' প্রচলিত ধর্মমতের জায়গা থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না—তাকে পেতে হলে নিজের মধ্যেই সাধনা করতে হয়। কিন্তু মানচিত্রের মতো অক্ষর-প্রতীক আছে। একজন সাধক বা সাধিকা এই অক্ষর-মানচিত্রের পথ ধরে চলে এই Angel-এর রূপ দর্শন পেতে পারে। আসলে, এই কথার মূল তত্ত্ব অনেক প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে– গ্রিক, মিশরীয়, সুফি আর ইহুদি সম্প্রদায় থেকে এই মূল তত্ত্ব লালনের বাণীর মতো আধুনিকভাবে নতুন হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশে প্রথমে এসে আমি দশ মহাবিদ্যার কালী সাধনায় যোগিনী কৃষ্ণদেবী কাছে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দীক্ষা পাই। অনেক যোগ সাধনা নিয়ে তাঁর কাছে শিখে আস্তে আস্তে বুঝি যে, মুসলমান ধর্মের মধ্যেও একই ধরনের কথা আছে। কিন্তু আসলে এই পরমাত্মা, আল্লাহ কে? যখন আমি ঢাকায় শাহবাগে লালনসংগীতের কথায় এই দিব্যজ্ঞানের মূল প্রশ্ন দেখি তখন অনেক আনন্দ পাই—'বল রে সেই মনের মানুষ কোন জনা'।

FIGURE 1. LAYLAH.
(Leda Bathurst Waddell.)

FIGURE 2 (left). Inner and outer coffins of Ankhefenkhons I (Ankh-af-na-khonsu), Egyptian Museum, Cairo.
Left, inner coffin; right, outer coffin.

যুক্তরাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক সাধনার ভঙ্গি (বামে) ও
মিশরের পুরানো স্থাপত্যে সাধনার প্রতিমূর্তি (ডানে)

চার

Pepperdine University-তে আমার আগে পড়াশোনার বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি (বিএ)। কিন্তু সে বিষয়ে ডিগ্রি নেওয়ার পর ওই বিষয়ের উপর মাস্টার্স করার আমার আর কোনো আগ্রহ থাকেন। কারণ, বাংলাদেশে সাধুসঙ্গ থেকে আমি সংসার কথাটার একটু ভিন্ন অর্থ শিখেছি এবং আমি মন থেকে বাউল পরিবেশের মতো "সহজ জীবন" বেছে নিতে চেয়েছি। Fulbright-এর সময়ে (২০১০ খ্রিষ্টাব্দে) আমি এক সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা ST. Joseph's School-এ ইংরেজি শেখানোর কাজ করেছি।

আর ২০ ঘণ্টা নিজের গবেষণা করতে পেরেছি। বাউল জগতে ঢুকে তো আমার সব কাজের আগ্রহ শেষ হয়ে যায়। নিজেকে লালনের মতো জিজ্ঞেস করি—"কৃতিকর্মার লেখাজোখা আর কি ফিরিবে।" তার জন্য আমি আমার একাডেমিক শিক্ষার বিষয় পরিবর্তন করি। এবার University of Washington-এ আমি M.A. করার জন্য Comparative Religion (তুলনামূলক ধর্ম) বিষয়টা বেছে নিই। ওখানে আমি প্রথমবারের মতো Carol Salomon-এর গবেষণাপত্র পড়ার সুযোগ পাই এবং তাঁর লালন গীতির অনুবাদ দেখতে পাই। সবই হয়তো "সাঁইর খেলা" বলতে পারি, কারণ আমি আগে জানতাম না যে উনি এ রকমের গবেষণাকর্ম আমার আগেই করেছেন। কিন্তু আমার মনে অনেক দুঃখ ও আফসোস এই জন্যে যে, উনার সাথে আমার কোনো দিন দেখা হয়নি, তার আগেই তিনি ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন।

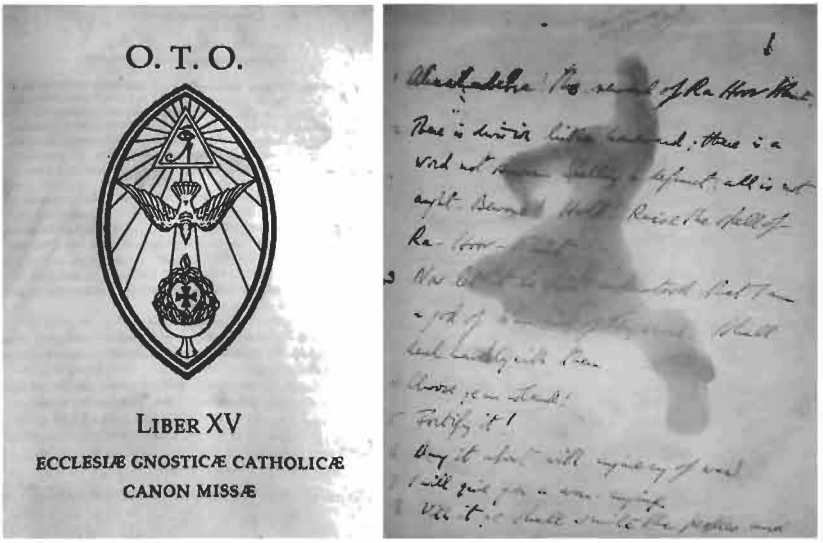

যুক্তরাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক সাধনার বইয়ের আখ্যাপত্র এবং একটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর জ্ঞান সাধনা ও গবেষণা আমাকে অবশ্যই আশীর্বাদ করেছে। অনেক ভাল শিক্ষা আমি University Of Washington থেকে পেয়েছি, কিন্তু আমার মনে বারবার প্রশ্ন উঠেছে– কিভাবে আমি বাংলার ভাব-সাধকদের এই বিশাল সাধনার জ্ঞান "আদি ভাবে" আমার আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় (যেমন O.T.O., A.·.A.·.)-এর সাথে মেলাবো, আর নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে তা প্রকাশ করব।

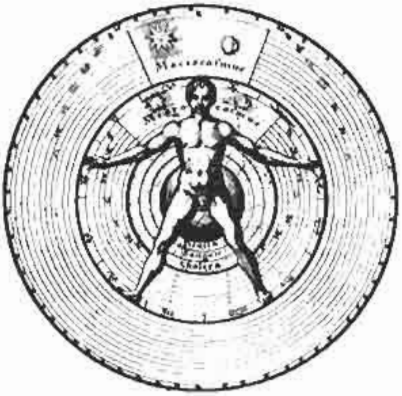

FIGURE 10. *Design suitable for top of Altar.*

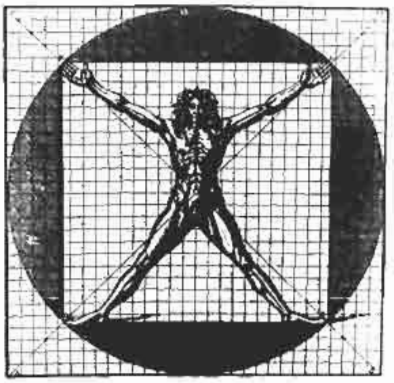

FIGURE 11. *The Microcosm of Vitruvius.*

পাশ্চাত্যের সাধকদের সাধনার স্তরবিন্যাস

বাংলাদেশ থেকে আবার আমি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে ভেবেছি যে, যুক্তরাষ্ট্রের লোক লালনের কথা বুঝলে ভাল কর্মফল হবে। কিন্তু শুধু বই থেকে লালনের গানের অনুবাদ পড়লে সংগীতের আসল অনুভব প্রকাশ পায় না। কারণ, লালনের গানের মধ্যে অনেক হিসাব-নিকাশ আর নিয়ম আছে, যেমন—এই গানের সুর, তাল, যন্ত্র ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে এবং গান গাওয়ার জন্যেও সঠিক সময়ের জ্ঞান থাকা দরকার আছে। সাধুদের মতে, প্রত্যেক গানের ভাব ঠিক রাখার জন্য এই হিসাব-নিকাশ ঠিক রাখতে হবে। মূলত এই বোধ থেকেই আমি লালনের কিছু গান বিশেষভাবে অনুবাদ করতে শুরু করেছি। আমার এই ইংরেজি অনুবাদে বাংলা আদি সুর ও ছন্দের সাথে মিল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে আমি একটি কথা বলতে চাই, আর তা হলো—আগে বাংলা ভাষা না শিখলে লালনসংগীত গাওয়া খুবই কঠিন হয়। আমার ধারণা, এখন এই অনুবাদের কারণে যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি বা যারা ইংরেজি শেখে, তারাও লালনসংগীত খুব সহজেই গাইতে পারবে।

উল্লেখ্য, আমার এই অনুবাদ-পদ্ধতির তিনটি দিক রয়েছে। এক. আমি প্রথমে চেয়েছি এমন সব ইংরেজি শব্দ নির্বাচন করতে, যার মধ্যে দিয়ে মূল বাংলা গানের

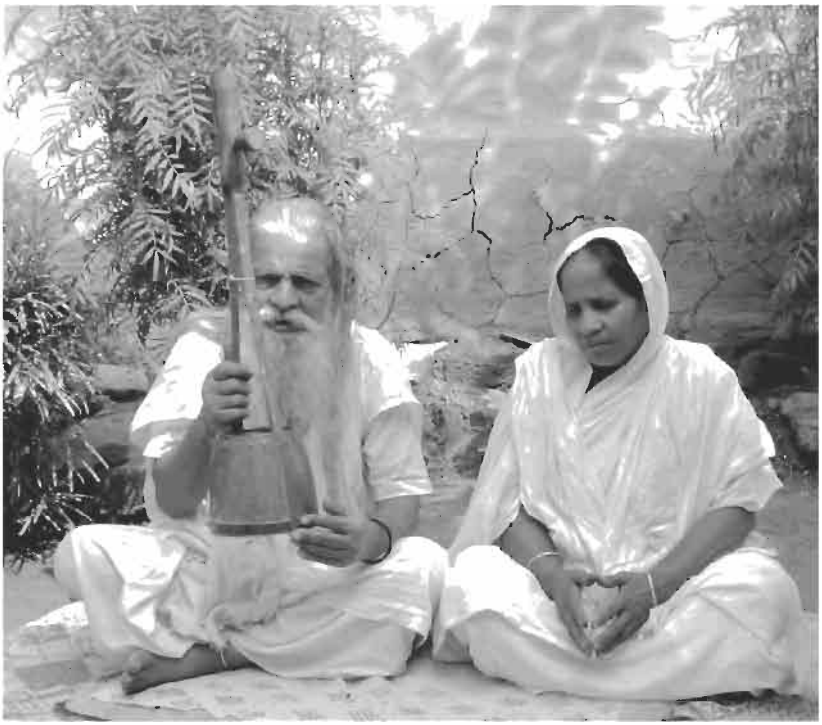

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা লালনপন্থী সাধক-সাধিকাদের সঙ্গীত পরিবেশনা

আদি ভক্তির ভাব প্রকাশ পাবে। এর জন্য প্রত্যেক গান অনুবাদ করার আগে আমি অনেকদিন ধরে বাংলার আদি ভাবে গেয়ে গেছি। আমার কেন জানি, আগেই মনে হয়েছিল যে, যদি আমি মূল বাংলা গানটা আদি ভাবে না গাইতে পারি তবে তা আমার পক্ষে অনুবাদ করা ঠিক হবে না। সেই অনুভব থেকে আমি কোনো একটি গানের সুর আর তাল আগে না বুঝে, না গেয়ে অনুবাদ করি না। আসলে, প্রায় সব সময় বাংলা গান গাইতে শেখার পরেই আমি ইংরেজির অনুবাদ করি। আমার মতে, এইভাবে গান অনুবাদ করতে পারলে গানের মূল লক্ষ্য 'ভজন-সাধন'ও সঠিক থাকে, আবার অনুবাদ করা গানে ইংরেজি শব্দও ভক্তির দিক থেকে শুদ্ধ হয়। ইংরেজি অনুবাদের এ নিয়ম লালনের "দৈন্য" বা প্রার্থনার গানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্ব।

আমার ইংরেজি অনুবাদের দ্বিতীয় দিক হলো—অর্থ। অনেক ভাল গবেষণা (যেমন Carol Salomon, Sashi Bhushan Das Gupta, Asim Roy, Edward C. Dimock, Manindra Mohan Bose) এই গভীর বিষয়ের উপর ইংরেজি ভাষায় এরমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। সাধুসঙ্গের মধ্যেও অনেক ভাল গবেষণার চর্চা হয়, আমার কাছে মনে হয় বাংলা ভাষার গানের বাণীর গূঢ় অর্থ মাঝে মাঝে আরো

পরিস্কার হয় সাধুসঙ্গে। তাই আমি অনুবাদ করার জন্য সাধুসঙ্গের মধ্যে জিজ্ঞেস করি এবং গবেষণা (বাংলা ও ইংরেজি) পড়ি। এরপর নিজের কাছে যখন গানের বাণীর সঠিক অর্থটা ধরা দেয় তখন অনুবাদ করি।

আমার অনুবাদের তৃতীয় দিক হলো মূলের সঠিক প্রকাশ। তার মনে যে লালনের গানের মধ্যে সাধনার অনেক গোপন কথা আছে। যদি অনুবাদের মধ্যে একই শব্দ বিভিন্ন গানে ব্যবহার করা হয় তাহলে লালনের গানের সেই গোপন মর্ম যুক্ত করা যায়। লালনের গানের ভিতরে 'মানুষতত্ত্ব' আছে—কিন্তু ভিন্ন ভাষায় এই অর্থ প্রকাশ করতে চাইলে অনুবাদের ভাষারও জ্ঞান অর্জন করা দরকার। তার মানে আধ্যাত্মিক প্রতীক যেমন আরবি ভাষায় এই অক্ষর 'আলিফ, লাম, মীম' লালন সাঁইজির গানের বাণীতে এসে গোপন মর্ম হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এই অক্ষরসমূহের মর্ম অন্যান্য ভাষাতেও দেখা যায়, যেমন—প্রাচীন হিব্রু ভাষার মধ্যে 'আলিফ লাম মীম'-এর মর্ম লুকায়িত আছে। অনুবাদকের এই সব তত্ত্ব জানা থাকলে অন্যান্য মানুষকে ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভাবে একই মানব দেহতত্ত্ব বুঝতে পারবে। আশা করা যায়, অন্যান্য গবেষক ও সাধক-শিল্পী এক সাথে মিল করে সারা পৃথিবীর মধ্যে লালন সাঁইজির মানব-ভক্তি ও সাধনার জ্ঞান প্রকাশ করবেন।

তথ্য নির্দেশ

1 ইংরেজিতে তাঁদের প্রিয় বানান হলো "Magick," ওই শব্দের প্রাচীন বানান এবং "a reversion to the word's archaic spelling to 'distinguish the Science of the Magi from all its counterfeits." এই গ্রন্থের ভূমিকায় পরের কথা আছে যে, "his intent in writing Book 4 was not only to restore to magick the respect and honor it commanded in earlier times; it was also to lay the cornerstone of a magico-religious system that would bridge the chasm between scientific skepticism and spiritual revelation." (Liber ABA, Book IV [revised second edition], p. xxiv.)

2 See Abraham ben Simeon, of Worms (attributed to, 15th c.). The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage: as delivered by Abraham the Jew unto his son Lamech, trans. S.L. MacGregor Mathers. 2nd ed., London: Watkins, 1900; rpt. Chicago: De Laurence, c. 1932; rpt. New York: Dover, 1975; rpt. Wellingborough, UK: Aquarian Press, 1976, 1985.

3 Letter and numerological symbolism has been in use since at least the Pythagoreans, who attached attributions to each number. The use of the Perso-Arabic alphabet, including Hebrew letters, to summarize the process of creation became prominent in Europe after the circulation of the Sefer Yeṣira and the Latin works of Athanasius Kircher several centuries later. (See Jaffee, p. 253).

১
আলেফ হে দাল আহাদ নূরী
আছে তিন হরফের মর্ম ভারী॥
আলেফে হয় আল্লাহাদি
মিমেতে নূর মোহাম্মাদি
লামের মানে কেউ করে না
নূক্তা বুঝি হল চুরি॥

নব্বই হাজার কালাম বাড়ী
নবীর উপর করলেন জারি
ত্রিশ হাজার শরিয়ত জারি
ষাট হাজার ভেদ বুঝতে নারী॥

সিরাজ সাঁই বলেরে লালন লালন
নূক্তার আগে কর নিরূপন
নূক্তা নিরিখ সঠিক যখন
থাকবে না আর কাট কাচারি॥

Ālif He Dāl[1] Light of Unity[2]
Here are three candles with heavy meaning.

In *Ālif* is *Āllāhādi*
In *Mīm* is *Nur Mohāmmadi*[3]
Lām's meaning no one knowing
Nūqtā[4] I'm fnding lost to thieves.

---

1. These are the Perso-Arabic letters *ālif, he* and *dāl*, which have the numerical values of one, five and four respectively. The well-known Baul singer Sādhu Humayon Fakir of Narshingdi, Bangladesh strongly prefers this version of the song; a more popular version has the frst line as: *ālif lām mīm āhād nūrī*. Regardless of version, the letters bear an obvious relationship with the three candles mentioned, and more implicitly reveal the word *āhād* and its three distinct letters as having a special interchangeable relationship with the letters *ālif, lām* and *mīm*.

2. Salomon cites a popular Baul song that clarifes the word Ahad (the One):

The head of the *ālipḥ* split
and a drop of light fell.
Mother in the form of Eve caught it.
The Lord, our protector, was born
in the form of *mīm*.

Ninety thousand pools of teaching
On the Prophet they're regulating
Thirty thousand *śariat*[5] rulings
Sixty thousand are unknown teachings.

Sirāj Sāin says, hey Lālan
Examine *nūqtā*'s recession
With *nūqtā*'s true calculation
Institutions will not remain.

"Mother Johura in the form of Eve
was the receptacle for the uncatchable Lord,
He took a body in the shape of an *ālipḥ*,
keeping his *mīm* form hidden
and became known as Ahad.

The signifcance of the name is that it differs from Ahamad (a name of Muhammad) only by the letter *mīm*, which itself often symbolizes the Prophet. Suf poets all over the world are fond of this play on words" (Salomon, Cosmogonic Riddles of Lalan Fakir, 285-289)

Schimmel adds the following: "The Sufs invented the hadith qudsi, and Ahmad bila mini, 'I am Ahmad (=Muhammad) without the letter m,' i.e., Ahad, 'One.' Only the letter m—the letter of creatureliness and trial, of discontinuity and limitation, of death (being the initial letter of maut, 'death'), and of the illusory aspect of: everything besides God—separates the Prophet—announced as Ahmad, the Paraclete (Sura 61:6)—from God, the One, the Eternal and Everlasting. The numerical value of the letter m is forty, and it thus corresponds to the forty stages through which man, having descended into the depths of created beings, can ascend again to God, eventually throwing off the 'shawl of humanity,' as a Punjabi poet has called the letter m" (Schimmel 224).

3. "It would be correct to compare the *nur muhammadi*, the Muhammadan Light, or the *hāqīqa muhammadiyya* to the active intellect of Hellenistic philosophy. One can say in this context that the whole world is created from the light of Muhammad: Israfl, the angel of Doomsday, is created from his heart; Gabriel becomes equivalent to the First Intelligence; Muhammad's intelligence corresponds to the heavenly Pen; and his soul to the Well-preserved Tablet" (Schimmel, Mystical Dimensions of Islam 224).

4. Bng. nūkta, from Arabic *nūqta*—point or dot, notable here as the frst written expression of the Qur'an, preceding the curve of the letter *bā* in the word *bismillah*. The *nūkta* is also a diacritic mark that distinguishes foreign words in scripts such as Devanagari.

5. From Arabic *sharī'at*—Islamic law.

[English translation by Keith E. Cantú, with assistance from Bidhan Fakir, Humayon Sadhu and the research of the late Dr. Carol Salomon]

২

বলরে সেই মনের মানুষ কোনজনা।
মা করে পতি ভজনা মাওলা তারে বলে মা॥

কেবা আদ্য কেবা সাদ্য
কার প্রেমেতে হয়ে বাধ্য
কে পাঠালো পরম তত্ত্ব
বেদে নাই যার ঠিকানা॥

একেতে দুই হলো যখন
ফুল ছারা হয় ফলের গঠন
আবার তারে করে মিলন
সৃষ্টি করলেন মনজনা॥

লা মোকামে সেই যে নূরী
আদ্য মাতা রূপ জহরী
লালন বলে বিনয় করি
আমার ভাগ্য ঘটলো না॥

Oh do tell, who is this Person of the Heart?
"Ma" adores him as beloved
The Father[1] says to her, "Ma."[2]

Who is Primal[3], Who is Worthy
In whose love one compelled will be
Who sends forth supreme doctrine[4]
That in scripture[5] has no home.

---

1. Bangla *māolā*, from Arabic *mawlana*—patron, protector; an epithet for Allah popular among some Suf groups, yet linked to Kālā, the black destroyer: "Kālā conceals in himself the name of Maulā [God] himself. The sky is black, black is earth and so are air and water. The moon is black, the sun is black and so is Maulā Rabbāni" (Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal,* 197).

2. This whole stanza presents translation difficulty due to specifc gender pronouns in English and purposeful ambiguity in Lalan's lyrics. Both "him" and "her" would refer to the "Person of the Heart," translated from Bng. *mānush* which can mean human (of any gender) yet refers to a specifc being or beings. The word used for "heart" is *man*, from Sanskrit *manas*—a relatively common word in which refers to both the mind and emotions, yet is physically placed in the heart rather than the head. Also notable is a possible letter play on the cosmogonic properties of the Perso-Arabic letters *ālif, mim,* and *lām.*

3. Bng. *ādya*—primordial, primary, pertaining to the source.

When the two become as one
Barren blooms bear fruit's formation
Once again making their union
Create the personal heart.[6]

In the Station of Nothingness[7] there is this Light[8]:
The First Mother[9], Jeweler[10] of Forms
Lalan says: "I submit humbly
as my fate remains unfurled."

---

4. Bng. *parama tattva*—the macrocosmic reality, or macrocosmic emanation (cf. the relationship between *jivātmā* and *parāmātma,* individual spirit and supreme spirit).

5. lit. the Vedas, often used in Lalan songs as an epithet for religious scripture in general.

6. Bng. *manjanā,* seems to answer the riddle of *kanjanā* "which person" in the frst line; for *man* see note 1 above.

7. Bng. *lā mokām*—Ar. *lā maqām* or *lāhūt,* one of the fve mystic "stations" (Ar. *nāsūt*) in Suf mysticism; in Baül syncretism linked to the crown or *saharārcakra* (cf. Salomon, Carol. "The Cosmogonic Riddles of Lalan Fakir," 272)

8. Bng. *nūrī* (from Ar. *nūr*), possibly relating to a feminine conception of the Supreme in semen, see note 10. (cf. Ibid., 272, 283)

9. Bng. *mātā,* also a verb that means "to be absorbed in madness or enthusiasm"—in another popular song Lalan characterizes the *lā maqām* or *saharārcakra* as an attic in which "a madman who is the Lord sits" (Salomon, Carol. "Baul Songs," 196) which lends credence to this dual-interpretation.

10. Bng. *jaharī,* also a derivation of Arabic *ẓahrā,* "luminous"; *al-ẓahrā* is the surname of Muhammad's daughter, Fatima which symbolically refers to the *śakti* in menstrual blood (cf. Salomon, Carol. "The Cosmogonic Riddles", 283.)

[English translation by Keith E. Cantú, with assistance from Bidhan Fakir, Umayon Sadhu, Prof. Nandini Abedin and the research of the late Dr. Carol Salomon]

৩

স্বরূপে রূপ আছে গিলটি করা
রূপ সাধন করল স্বরূপ নিষ্ঠা যারা॥

রূপ বলতে কি হয় রূপ সাধন
তবে কি আর ভয় ছিল মন
এই মহারাগের কারণ
স্বরূপ দ্বারা॥

শতদল সহস্রদলে
রূপ স্বরূপে ভাটা খেলে
ক্ষণেক রূপ রয়
নিরালে নিরাকারা॥

আসবে বলে স্বরূপ মণি
থাক গা বসে ভাব ত্রিবেণী
লালন বলে সামাল ধনী
সেই কিনারা॥

In my own form there is a gilded form
The steadfast in their own form
Strive to forge with form.

Will speaking of form make form strive
Has fear again entered my mind
From this emotion sublime
Through my own form.

Hudred parties in one thousand
Forms in my own form play downstream
For a moment in hiding
Forms turn shapeless.

The jewels of the self are forming
Stay sitting with bhab trinity
Lalon gives a warning cry
Here's the shoreline.

৪
আপন মনের বাঘে যারে খায়
কোনখানে পালালে বাঁচা যায়॥

বন্ধ ছন্দ করি এঁটে
ফসকরে যায় সকল কেটে
মনের বাঘ গর্জে ওঠে
সুখ পাখিরে হানা দেয়॥

মরণে যে আগে মরে
কোন বাঘে কি করতে পারে
মরা সেই কি আবার মরে
মরিয়ে যে জিন্দা রয়॥

মরনের আগে মরা
গুরুপদে মন নঙ্গর করা
লালন তেমনি পতঙ্গের ধারা
অগ্নিমুখো ধেয়ে যায়॥

If you're devoured by the tiger of your mind
Oh where will you fly to stay alive.

With desire I tread carefully
So quickly all is swiped away
The tiger of my mind roaring
Rises to slay the happy bird.

To cause death before dying
What tiger has the ability
Will the dead ever again die
Even dying they will survive.

Within death before dying
In the guru-path mind anchoring
Lalon just like a moth flying
Heads straignht for the fires face.

৫

গুরু তুমি পতিত পাবন পরমেশ্বর
অখণ্ড মণ্ডলা কারং
ব্যাপ্তং জনে চরাচর॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনে
ভজে তোমায় নিশিদিনে
আমি জানি না কো তোমা বিনে
গুরু তুমি পরমেশ্বর॥

ভজে যদি না পাই তোমার
এই দোষ আমি দিব বা কার
আমার নয়ন দুটি তোমার উপর
যা কর তুমি এইবার॥

আমি লালন একই সিঁড়ে
ভাই বন্ধু নাই আমার জোড়ে
ভুগে ছিলাম পক্সজ্বরে
দরবেশ সিরাজ সাঁই করল উদ্ধার॥

Guru thou crt deliverer, o thou suprere soul
Unbroken circle of causatron
Round this fellow all things roll.

Brahma, Visnu, Siva these three
Worship in thee night and day
Without thee I will not realize
Guru thou art there own another.

If worship does not reach thy feet
How can I place blame on any
With my radiant sight upon thee
Do what thou wilt here today.

I Lalon cry this on the stair
No friend or brother in my pair
Being struck by small-pox fever
Dervish Siraj sai makes my escape.

৬
এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে॥

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে॥

কত ভাগ্যেও ফলে না জানি
মনরে পেয়েছ এই মানব তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় তোমার
সুধারায় যেন ভরা না ডোবে॥

এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠলেন নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার
লালন কয় কাতর ভাবে॥

Will such a human birth again occur
On heart of mine act quickly
While here in this world.

Limitless form made by the spirit
I hear nothing is better than humankind
Gods and goddesses in adoration
Pray to take a human birth.

How many furits of fortune I know not
My heart you have received this human boat
Quickly sail but in your nice flow
Make sure not to sink below.

In humankind will arise a sweet offening
For this Nianjan built the human form
If tricked the river bank I won't see
Lalon cries earnestly.

৭
আগে জান না রে মন বাজি হারিলে পতন
লজ্জায় মরণ শেষে কাঁদলে কি হয়
খেলা খেল খেলারু ভাবিয়ে শ্রীগুরু
অধঃপথে যেন মারা নাহি যায়॥

এইদেশে দেখি যত জুয়া চুরি খেলা
টুটকা দিয়ে ফটকায় ফেলে রে মন ভোলা
তাই বলি বারংবার খেলা খেল হুঁশিয়ার
নয়নে নয়ন বাধিয়ে সদায়॥

চোরের সংগে কভু খাটে না ধর্ম ছাড়া
হাতের অস্ত্র কভু কর না হাতছাড়া
রাগ অস্ত্র ধর দুষ্ট দমন কর
স্বদেশে গমন কররে ত্বরায়॥

চুয়াণি বাধিয়ে খেলে যে জনা
সাধ্য কিরে তার অঙ্গে দেয় হানা
লালন বলে আমি তিন তের না জানি
বাজি সেরে যাওয়া ভার হলরে দায়॥

Oh my heart had you only known wayword trials on the road
Finlly dying in shame will your tears help you
Though you think on the guru still the game plays you
Spiraling down for all eternity.

In this land I perceive waste and thievery
Dazzled by bright lights you forget heart of mine
So I say time after time as a far warning
Always play the game with a watchful eye.

Even hanging with threves won't slice the spiritual stream
Even hand-weapons won't create empty hands
Strap on your anger stay the delusion
Quickly adventuring in the land of the self.

Drunk off chowani all the people play
Is it worth while for them to rough up their frame
Lalon says I don't know three from thirteen
What will it take to make these trials flee.

৮
তুমি এসো হে প্রভু নিরাঞ্জন
এ ভব তরঙ্গ দেখে
আতঙ্কেতে যায় জীবন॥

তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি
অনাদির হও আদ্য শক্তি
দাও হে আমার ভক্তির শক্তি
যাতে তৃপ্ত হয় জীবন॥

ধ্যান যোগে তোমাকে দেখি
তুমি সখা আমি সখী
মম হৃদয়ও মন্দিরে থাকি
দাও ওই রূপ দর্শন॥

ত্রিগুণে সৃজিলেন সংসার
লীলা দেহে কয় লালন তার
সাদরাতুল মুনতাহার উপর
নূর তাজেল্লার হয় আসন॥

Oh come thou spirit over the stainless sea
Seeing this here turbulent world
Life goes by in panicking.

Thou art delight, thou art release
From before time, primal energy
Grant me now my love energy
In birth life turns happily.

Joining in dhyana I see thee
Thou art the groom, I am the bride
In my heart and shrine I reside
Give this vision without form

From tri-from energy, the world—
Seeing the play, Lalan says our
Perch atop the tree of wonder*
On the seat the moonlight shines.

* from Ar. sidr t al-Muntah

REFERENCES AND FURTHER READING

Adamson, Peter

2002 *The Arabic Plotinus: A Philosophical Study of the 'Theology of Aristotle'*. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd.

Attar, Farid ud-Din

1984 *The Conference of the Birds.* London: Penguin Books.

Bose, Manindra Mohan

1930 *The Post-Caitanya Sahajia Cult of Bengal.* Calcutta: University of Calcutta.

Capwell, Charls H.

1974 "The Esoteric Belief of the Bauls of Bengal." *The Journal of Asian Studies, Vol. 33, No. 2 (Feb., 1974),* pp. 255-264

Crowley, Aleister

1999 *The Book of Thoth.* York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc. [1944]

1991 *Liber Alephvel CXI.* York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc. [1962]

2004 *Magick: Liber ABA, book 4*, parts I-IV. With Mary Desti and Leila Waddell;

[1913]edited, annotated, and introduced by Hymanaeus Beta. 2nd rev. ed.

Das, Rahul Peter

1992 "Problematic Aspects of the Sexual Rituals of the Bauls of Bengal." *Journal of the American Oriental Society, Vol. 112, No. 3 (Jul – Sep., 1992)*, pp. 388-432

Dimock, Edward C

1966 *The Place of the Hidden Moon: Erotic Mysticism in the Vais ava-sahajiya Cult of Bengal.* Chicago and London: University of Chicago press.

Gunther, J. Daniel

2009 *Initiation in the Æon of the Child.* Lake Worth, Florida: Ibis Press.

Hossain, Fakir Anwar (Mantoo Shah)

2008 *L lon Sang t.* Vol. 1-3. Kushtia, Bangladesh: Lalon Majar Sharif. [1993]

Jaffee, Martin

2006 *Early Judaism: Religious Worlds of the First Judaic Millennium.* "Initiation into Transformative Knowledge," p 231-262. Bethesda: University of Maryland Press.

Moore, Edward

2002 Neoplatonism. *Internet Encylopedia of hilosophy* <http://www.iep.utm.edu/neoplato/>

Roy, Asim

1983 *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal.* Princeton, N.J.: Princeton University Press

Salomon, Carol

1995 The Bauls. *Religions in India in Practice.* Donald S. Lopez, Jr., ed. Princeton: Princeton University Press. pp. 187-208.

1991 The Cosmogonic Riddles of Lalan Fakir. *Gender, Genre and Power in South Asian Expressive Traditions.* Arjun Appdurai, Frank Korom, and Margaret Mills, ed. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 267-304.

Schimmel, Annemarie

1975 *Mystical Dimensions of Islam.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Scholem, Gershom

1962 *Origins of the Kabbalah* (Originally published in German under the title *Ursprung und Anfänge der Kabbala*). Princeton, N.J.: The Jewish Publication Society / Princeton University Press

Woodroffe, Sir John [Arthur Avalon]

1959 *Sakti and Sakta: Essays and Addresses on the Sakta Tantrasastra.* Madras (Chennai), India: Ganesh & Co. (Madras) Private Ltd.

2002 *Prapañcasara Tantra of Sankaracarya.* Delhi: Motilal Banarsidass. [1935]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

এই অনুবাদ-সাধনার কাজে অনেকের সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই– হুমায়ূন সাধু, বিধান ফকির, বলাই শাহ, টুনটুন শাহ, আনু ফকির, ভটন গুরু, গুরুমা যোগিনী কৃষ্ণ দেবী, বাবু শাহ, নজরুল শাহ, ম্যাদেলিন বেকের আর জোনাথান জোনসন, অধ্যাপক নন্দিনী আবেদীন, দি এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস-এর বাংলা বিভাগ এবং দি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের কম্পারেটিভ রিলিজিওন ডিপার্টমেন্টস-এর ড. জিম ওয়েলমান, ড. রিচার্ড সলোমন; বাংলা একাডেমীর সহপরিচালক সাইমন জাকারিয়া; প্রয়াত আমেরিকান গবেষক ও লালন-সংগীতের অনুবাদক-বিশ্লেষক ড. ক্যারল সলোমন এবং সেইসঙ্গে ঢাকার লালন আখড়া ধানমণ্ডি ২৭-এর সবাইকে; আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ আমার মা আর বোনকে; সবাইকে অনন্ত ভালবাসা জানাই।

–কিথ ই. কাস্ত

খণ্ড ১, সংখ্যা ১ | ভাবনগর | আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 | BHABNAGAR | August 2014

আধুনিকযুগের ধর্ম এবং একজন সাধকের দর্শন

জাপানি ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থালোচনা

নাজমীন মর্তুজা

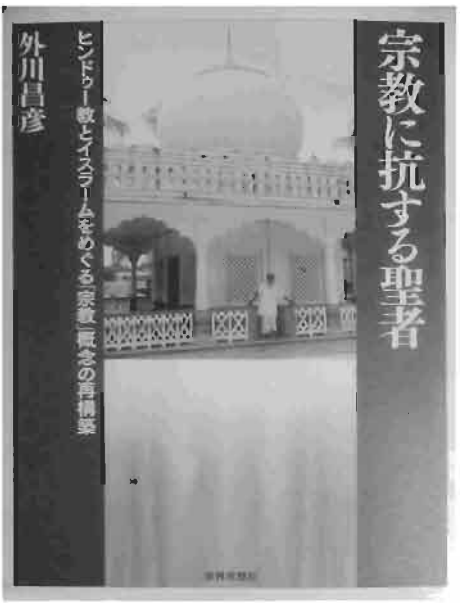

জাপানি ভাষায় মাসাহিকো তোগাওয়া-র রচিত
লালন বিষয়ক শুক্যোনি কৌসুর সেইজা-র প্রচ্ছদ

Modern religion and the philosophy of a *Sadhaka*

Book review : Published in the Japanese Languages

Nazmin Mortuza

Book Review

Abstract

The compositions of Bangladesh's ever-revered *bhab-sadhaka* Fakir Lalon Sain have been published in a book in the Japanese language. The book's author Masahiko Togawa a professor in Japan in Hiroshima University's Cultural anthropology department. The book summarizes how a Japanese university professor received initiation from the *sadhaka* community. In his summary he describes how he received the opportunity to blend in with the secretive Baul-*sadhaka* communities. Masahiko Togawa's book is thus a uniquely written account filled with significance. In this book he takes a different direction from conventional research on Lalon and recognizes its errors, allowing him to cover alongside his account the controversy over Fakir Lalon Sain's Hindu or Muslim origin at birth and how it began. Along with covering Lalon Sain's life, his worldview, song melodies and lyrics, he discusses reveals the modern impact of Lalon's messages and gives a history of their commercial development. The text is accompanied by photographs, maps, newspaper clippings, Rabindranath's manuscripts, audiocassettes, CDs and more which he reproduces in print.

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গীয় চর্চা বা বেঙ্গল স্ট্যাডিজ দীর্ঘদিন ধরে চলমান। ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি অপরাপর যে সব ভাষায় বেঙ্গল স্ট্যাডিজের কথা জানতে পারি, তার মধ্যে ফরাসি ভাষা, ডাচ ভাষা, চেক ভাষা, জাপানিজ ভাষা, চীনা ভাষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আসলে, প্রায় শতাধিক বছর ধরে এই সব ভাষাতে বাংলার ভাষা, দর্শন এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা, গবেষণা ও বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। ভিন্ন ভাষীদের মধ্যে জাপানের প্রখ্যাত গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ভাবচর্চা, হিন্দু সংস্কৃতি এবং লালনপন্থী ভাবসাধকদের জীবন, সংগীত ও দর্শন নিয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, এমনকি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। মাসাহিকো তোগাওয়া পেশাগত জীবনে জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান ও উন্নয়ন বিভাগের অধ্যাপক। তিনি জাপানের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের ভাবসাধক শিরোমণি ফকির লালন সাঁই-য়ের উপর জাপানিজ ভাষায় বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

তোগাওয়া-র গ্রন্থটির জাপানিজ নাম—*শুক্যোনি কৌসুর সেইজা : হিন্দু-কিও তো ইসলাম ওয়া মিগুরু শইউকিওউ গ্যাইনিন নো সাইকোউছিকু*, লেখকের মতে, এই শিরোনামের বাংলা অর্থ হয়—আধুনিকযুগের ধর্ম এবং একজন সাধকের দর্শন। শিরোনামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই একজন সাধক হলেন—লালন সাঁই। গ্রন্থে লালন সাঁইজির জীবনী বির্তক থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ও লালন সাঁইজির দর্শন; বৃটিশ, পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশে লালন চর্চার বিবর্তনের ধারা, এমনকি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে লালনের আখড়া রক্ষার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা-সহ গ্রন্থটি মোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থের ভূমিকাতে ধর্মের ধারণা, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও সুফি সাধনার সম্পর্ক, হিন্দুধর্ম ও সাধুদের

কুষ্টিয়ার লালনপন্থী সাধুগুরুদের মাঝখানে গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া

সম্পর্ক, বাউল কি, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সাথে বাউলের সম্পর্ক কি, সাধক বলতে কি বোঝায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'লালন হিন্দু কি মুসলমান'। এই অধ্যায়ে ফকির লালন সাঁই-য়ের জীবনীর প্রচলিত ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, একই সঙ্গে হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত লালনের জীবনী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে লালন, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বৃটিশ কাল পর্বে লালনের জীবনীর বিভিন্ন দিক, পাকিস্তান কাল পর্বে লালন জীবনী নিয়ে দ্বিমত শুরুর প্রসঙ্গ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে লালনের জীবনী লেখার ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে তিনি পাকিস্তান আমলে 'দ্বিমত শুরু' উপশিরোনামে হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত লালন-জীবনীর ইঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বসন্তকুমার পালের রচনা এবং মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত নূর মোহাম্মদের রচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কালের লালন গবেষক আবু তালিব, এস.এম. লুৎফর রহমান, খোন্দকার রিয়াজুল হক, আনোয়ারুল করীম-এর মত বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর 'মতের বিরুদ্ধে' উপশিরোনামে তিনি এ এইচ এম ইমামউদ্দিন, আবুল আহসান চৌধুরী, ম.মনিরুজ্জামান প্রমুখ গবেষকের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—'লালনের ধর্মীয় দর্শন'। এই অধ্যায়ে গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া যথাক্রমে বাংলার বাউল ও লালন ফকির, ফোকলোর ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে কবীর থেকে বাউলদের দর্শন ও লালনের গানের বাণীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে লালনের গানের সান্ধ্যভাষা বা গূঢ়তত্ত্ব এবং দেহতত্ত্বের গানের মর্মকথা ব্যাখ্যা করেছেন। তবে, তিনি এই অধ্যায়ে শেষে লালনের গানের অর্থ বোঝার জন্য একটাই সমাধান দিয়েছেন, আর তা হলো—সাধনা ছাড়া লালনের গান বোঝা যাবে না। এক্ষেত্রে তিনি হয়তো সাধুদের মতোই গুরুকে শরণ নেওয়াকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—'সুফিবাদী ইসলাম ও লালন'। এই অধ্যায়ে ইসলাম ধর্মের শরিয়তি ধারা ও মারফতি ধারার তুলনা মূলক আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আল্লাহ এবং খাস তরিকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি পুনর্জন্ম ভেদ প্রসঙ্গে লালনের তান্ত্রিক সাধনার কথা এবং সুফিবাদের মধ্যে তন্ত্রসাধনার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এখানে বাংলাদেশের ধর্মী সাধনার বিস্তার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গবেষক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, বাংলাদেশের ধর্মীয় সাধনার বিস্তারের একদিকে রয়েছে সুফি সাধনার ধারা, অন্যদিকে রয়েছে তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি। লালনের সাধনার ধারা এই দ্বিধাবিভক্ত সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র এবং তা পর্যবেক্ষণমূলক। এছাড়া, সুফিবাদ ও বাউলতত্ত্বের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত তিনটি হরফ আলিফ, লাম ও মিমের ব্যাখ্যা হাজির করেছেন এই অধ্যায়ে।

শুক্যোনি কৌসুর সেইজা গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায় লালনপন্থী সাধকদের ভেক খেলাফত অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বের চিত্র

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম—'বাউল সাধকদের রক্ষার আন্দোলন'। এই অধ্যায়ে গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া ইতিহাসের আলোকে বাউল সাধক শিরোমণি লালন সাঁইজির মত, দর্শন, জীবন-সাধনা এবং বাউল-সাধকদের আশ্রম বা আখড়া বাড়ি রক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে বৃটিশ উপনিবেশ কালে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে শরিয়তপন্থীদের প্রবর্তিত বাউল ধ্বংস ফতোয়া থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকারীভাবে লালন সাঁইজির মাজার দখলের ঘটনা বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়ের আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকারীভাবে লালন সাঁইজির মাজার দখলের সময় পুলিশের লাঠির আঘাতে লালনপন্থী সাধক বিল্লাল শাহ মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং পরে মরা যান। এই অধ্যায়ের আলোচনায় ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে লালন আখড়া রক্ষা কমিটি গঠিত হবার ইতিহাস বিশ্লেষণে মাসাহিকো তোগাওয়া তথ্য দিয়েছেন যে, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে শেখ হাসিনা লালনের আখড়া বাড়িতে অডিটোরিয়াম ও রেস্টহাউজ নির্মাণের ঘোষণা দেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কবি, লেখক ও সুধী সমাজের তৎপরতায় লালন আখড়া রক্ষা কমিটি গঠিত হয়। এই রক্ষা কমিটির আন্দোলনের মুখে হাইকোর্ট লালনের আখড়ার মধ্যে সব ধরনের ভবন নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরই মধ্যে লালনপন্থী ফকিরদের সমন্বয়ে আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহের নেতৃত্বে লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু গবেষক এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, ঢাকার সুধী সমাজ কর্তৃক গঠিত লালন সাঁইজি-র আখড়া রক্ষার কমিটি ও লালনপন্থী সাধকদের সেবা-সদন কমিটির মধ্যে সেই আন্দোলনে কোনো সমন্বয় ছিল না।

শুক্যোনি কৌসুর সেইজা *গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা*

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম—'বাউলের সংগ্রাম'। এই অধ্যায়ে লালনপন্থী সাধক হিসেবে গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া তার নিজের কথা জানান দিয়েছেন। কেননা, তিনি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামের লালনপন্থী সাধক আলাউদ্দিন শাহের কাছে

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন সমাধিপ্রাঙ্গনে দুই প্রবীণ সাধকের পদচারণা

লালনমতে দীক্ষা নিয়েছেন। লালন আখড়া রক্ষার আন্দোলনের জন্য তিনি জাপান থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র প্রথম আলো-তে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

এই অধ্যায় থেকে জানা যায়, তাঁর সেই প্রতিবেদন প্রকাশের পর সাময়িকভাবে লালন আখড়া প্রাঙ্গণে কন্ট্রাকশন তৈরি কাজ থেমে যায়। কিন্তু ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে আবার কোনো এক রহস্যময় কারণে কন্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়। গবেষক এই অধ্যায়ে লালন আখড়া রক্ষার সেই ব্যর্থ সংগ্রামের রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন।

গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া-র সাথে আলোচক নাজমীন মর্তুজা

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম—'ওয়ান্ড হেরিটেজ হিসেবে বাউল গান'। এই অধ্যায়ে ইউনেস্কো কর্তৃক ইন্ট্যানজিবল হেরিটেজ হিসেবে বাউল গানের স্বীকৃতি দানের প্রসঙ্গ এবং বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রিক শিল্পীদের মধ্যে বাউল গানের চর্চা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই আলোচনায় গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া লালনসংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী ফরিদা পরভীন থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক তরুণশিল্পী আনুশেহ আনাদিলের গায়কী নিয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। একই সঙ্গে মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাউল গান চর্চার সাম্প্রতিক ধারা বিশ্লেষণ করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়টি হলো এই গ্রন্থের উপসংহার, যার শিরোনাম হচ্ছে—'ধর্মীয় দর্শন ও লালন'। এই অধ্যায়ে গবেষক মূলত আধুনিকযুগে লালন সাঁইজির দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করেছেন।

গবেষণাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই গ্রন্থে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র, শব্দের ব্যাখ্যা, নির্ঘণ্ট এবং মানচিত্র, আলোকচিত্র, হস্তলিপি ইত্যাদি মুদ্রিত হয়েছে।

জাপানের সুধীসমাজে বাংলাদেশের ভাবসাধক শিরোমণি লালন সাঁইজি-র জীবন-দর্শন ও সংগীতকে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বিশেষভাবে সহায়ক হচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস। একই সঙ্গে লালন সাঁই-এর দর্শনের বীজ একজন ভিন্নভাষী গবেষকের দৃষ্টিতে কীভাবে ব্যাখ্যাত এবং বিশ্লেষিত তা জানার জন্য গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ অতীব জরুরি বলে মনে করি।

* গ্রন্থকার ও গবেষক গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া-এর সাথে আলাপের ভিত্তিতে এই পুস্তক আলোচনাটি রচিত।

খণ্ড ১, সংখ্যা ১ | ভাবনগর | আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 | BHABNAGAR | August 2014

বাংলাদেশের সাধক-কবিদের প্রতি
আমেরিকান ও জাপানি গবেষকের লেখা চিঠি

ক্যারল সলোমন ॥ মাসাইয়ুকি ওনিশি

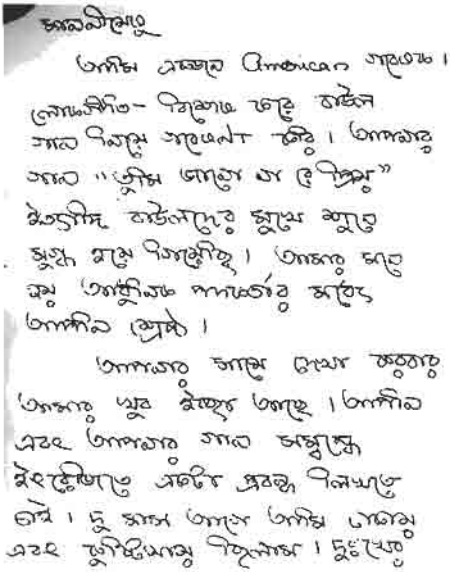

সাধক-কবি বিজয় সরকার-কে লেখা
ক্যারল সলোমন-এর চিঠির একাংশ

To the *Sadhaka*-Poets of Bangladesh
Latters posted from the researchers of America and Japan

Carol Salomon ॥ Masayuki Onishi

Letters from researcher

Abstract

Two academic researchers, Carol Salomon [1949-2009] from the United States and Masayuki Onishi [1951-] from Japan, had written several Bangla letters over the past several decades that are published here. The letters were addressed to several *Sadhaka*-poets or aspirants of Bangladesh. The letters are included based upon their importance and relevance to the field of Bengal Studies.

Khoda Baksha Shah [1928-1990] is one of the important Lalon sadhakas in Bangladesh. He delved deep into the meaning of Lalon's philosophy. Khoda Baksha Shah, as a singer of Lalon songs, played a significant role in introducing Lalon songs to urban listeners and artists. He joined Bangladesh Shilpakola Academy as a teacher of Lalon songs in 1983 and worked there until 1987. The Bangla Academy awarded him a fellowship in 1985. He contributed greatly to finalizing the notation of the songs of Lalon Sain, and the researcher Sudhin Das later published a book on the notations of 25 Lalon songs that he regularly sang. Khoda Baksha Shah was given a posthumous Ekushey Padak award in 1991.

Fakir Anowar Hossain Mantu Shah [1936-2011] was an ascetic sadhaka who followed the tradition of Lalon. He was famous for his collection and anthology of the songs of Lalon Sain. He published 3 volumes of the collection of Lalon songs, titled Lalon Sangeet, during the period of 1993 to 1998. Aiming at ensuring the rights of the Lalon followers, he founded "Lalon Majar Sharif and Seba Sadan Committee" (1984) and was the Chair of this committee.

Bijoy Sarkar [1902-1985] was a noted saint poet in both Bangladesh and West Bengal. He was essentially the master of *Kabigaan,* a renowned form of Bengal folk performance. He modernized *Kabigaan,* harmonizing it with the elements of modern written literature. He was also famous in performing Ramayan songs and left behind several philosophical poems.

লালনপন্থী সাধক খোদাবক্‌শ শাহের সাথে আমেরিকান গবেষক ক্যারল সলোমন

খোদাবক্‌শ শাহকে লেখা ক্যারল সলোমনের চিঠি

চিঠি : ১

১২/১০/৮৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সর্বপ্রথম আপনি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি জানবেন। আশা করি আপনি ভাল আছেন। আপনাকে চিঠি দিতে অনেকটা দেরি করে ফেলেছি। তার জন্য আপনার ক্ষমা চাইছি। আমি ইউভার্সিটিতে বাংলা পড়াচ্ছিলাম। কাজের চাপ এত বেশী ছিল যে নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। এখন সেই কাজ আর নেই। চিঠি না দিলেও আপনার কথা আমি ভুলতে পারি নি। আপনার কাছে যে সাহায্য পেয়েছি তার পরিশোধ আমি কোনওদিন করতে পারবো না। আমি চিরকাল আপনার কাছে ঋণী থাকবো।

এই চিঠিটা আমার বন্ধু হাসনা খানের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের শহরে থাকে। যখন আমি ঢাকায় ছিলাম তার আম্মার বাসায় উঠেছিলাম।

কয়েক সপ্তাহ আগে আবার লালনগীতির অনুবাদ কাজে হাত দিলাম। কাজটা বেশ ভাল চলছে। আপনার সাহায্য যদি না পেতাম এই কাজটা সম্ভব হতো না। বইয়ের লেখা শেষ করতে এখনও অনেক দেরি আছে। আবার বাংলাদেশে যেতে হবে। আমার মনে হয় এক কিংবা দু বছর পরে যেতে পারবো। আপনার জীবনী বেশ বড় আকারে বইটার শুরুতে থাকবে এই আমার ধারণা। আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আপনার জীবনী লিখতে সময় ছিল না। আপনি যদি পারেন আপনার জীবনী লিখে আমার বন্ধুর হাতে দেবেন। আপনি তাকে এক নির্দিষ্ট দিন বললে সেই দিন আপনার লেখা নিতে শিল্পকলা একাডেমীতে যাবে। আপনি যদি এই কাজটা করতে না পারেন কোনও ক্ষতি নেই। আবার যখন ফিরে যাবো সেই কাজ আগে করবো।

১২/১০/৮৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সর্বপ্রথম আপনি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি জানবেন। আশা করি আপনি ভাল আছেন। আপনাকে চিঠি দিতে অনেকটা দেরি করে ফেলেছি। তার জন্য আপনার ক্ষমা চাইছি। আমি ইউনিভার্সিটিতে বাংলা পড়াচ্ছিলাম। কাজের চাপ এত বেশী ছিল যে নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। এখন শেষ কাজ আর নেই। চিঠি না দিলেও আপনার কথা আমি ভুলতে পারি নি। আপনার কাছে যে সাহায্য পেয়েছি তার পরিশোধ আমি কোনদিন করতে পারবো না। আমি চিরকাল আপনার কাছে ঋণী থাকবো।

এই চিঠিটা আমার বন্ধু মাসুদ খানের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে ২ অক্টোবরে আসছে। যখন আমি ঢাকায় ছিলাম তার আম্মার বাসায় উঠেছিলাম।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমার লালনগীতি-অনুবাদ তাকে হাতে দিলাম। কাজটা বেশ ভাল চলছে। আপনার সাহায্য যদি না পেতাম এই কাজটা সম্ভব হতো না। বইয়ের লেখা শেষ করতে এখনও অনেক দেরি আছে। আমার বাংলাদেশে যেতে হবে। আমার মনে হয় এক কিংবা দু বছর পরে যেতে পারবো। আপনার জীবনী বেশ বড় আমার বইটির অংশরূপে থাকবে এই আমার ধারণা। আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আপনার জীবনী-লেখার সময় ছিল না। আপনি যদি পারেন আপনার জীবনী লিখে আমার বন্ধুর হাতে দেবেন। আপনি আগে এক নির্দিষ্ট শিল্পী বললে সেই দিন আপনার লেখা দিতে চিন্তা করলে

লালনপন্থী সাধক-শিল্পী খোদাবকশ শাহকে লেখা ক্যারল সলোমন-এর একটি চিঠির প্রথম পৃষ্ঠা

আপনার কাছে আমার আর একটা অনুরোধ আছে। আমি আপনার ও মণির একটা টেপ হারিয়ে ফেলেছি। তাতে লালনের কয়েকটা গান ছিল যে আমার খুব প্রিয়। আপনি একটা টেপ আমার জন্য রেকর্ড করতে পারলে বাধিত করবেন। আমার বন্ধুর হাতে একটা খালি টেপ পাঠিয়েছি। আমার কৃতজ্ঞতা স্বরূপে সামান্য গুরুদক্ষিণাও পাঠিয়েছি। আপনি তাকে যে দিন বলবেন সে সম্পাদিত টেপ নিতে যাবে। আমি যে গানগুলো বিশেষ করে চাই সেগুলোর একটা তালিকা এই চিঠির সাথে পাঠালাম। আপনার গান শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। নতুন টেপ পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হবো।

মণিকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা জানাবেন। আপনি আবার আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। মাঝে মাঝে চিঠি দেবেন।

ইতি
বিনীতা
কেরল সালোমন

Carol Salomon
2347 N. 60th Street
Seattle, Wa. 98103
U.S.A.

গানের তালিকা

(যতটা পারেন ততটা টেপ করবেন। আর কোনও গান আপনার গাইবার ইচ্ছা থাকলে সে গানও গাইবেন।)

১) গুরুর দয়া যারে হয় সেই জানে
২) মুরশিদের ঠাঁই নে নারে সেই ভেদ বুঝে
৩) রসের রসিক না হলে কে গো জানতে পায়
৪) গুণে পড়ে সারলি দফা
৫) খালি ভাঁড় থাকবে রে পড়ে
৬) এখন আর ভাবলে কি হবে কৃতিকর্মার লেখাপড়া আর কি ফিরিবে
৭) চিরকাল জল ছেঁচে আমার জল ছাড়ে না ঐ ভাঙ্গা নায়
৮) সোনার মান গেল রে ভাই বেঙ্গা এক পিতলের কাছে
৯) মন কি তুই ভড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া
১০) কুলের বৌ হয়ে মন আর কতদিন থাকবি ঘরে
১১) এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষেপা
১২) মনের লেঙটি এঁটে করো ফকিরী
১৩) ফের পলো তোর ফকিরীতে
১৪) নামে রসিক নাম ধরিয়ে মন বেড়াও জগত মাতিয়ে।

চিঠি : ২

১৯/৮/৮৮

প্রেরক : Carol Salomon
2347 N. 60th Street
Seattle, Wa. 98103
U.S.A.

শ্রদ্ধাভাজনেষু

সাঁইজি। আশা করি প্রভুর কৃপায় আপনি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। আমরা সবাই ভাল আছি। বহু দিন আপনাকে চিঠি দিই নি বলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। যদিও এত দিন চিঠি দিই নি একদিনও আপনার ও মণির কথা ভুল যাই নি। আপনার ও মণির পাঠানো ক্যাসেট খুবই সুন্দর হয়েছে। স্টুডিও থেকে এতগুলো গান কষ্ট করে রেকর্ড করেছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনি জীবনীও বেশ ভাল লিখেছেন। আমার বইয়ের মধ্যে থাকবে।

আপনার মত সাধুলোক পৃথিবীতে খুব কম পাওয়া যায়। আপনার কাছে কয়েক মাস ধরে কাজ করতে পেরেছি এবং আমাকে মেয়ে বলে মেনে নিয়েছেন সেই জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। আশা করি আবার আপনার কাছে কাজ করতে পারবো।

আপনি লিখেছেন যে এই দেশ আপনার দেখার ইচ্ছা আছে। আপনি ও মণি যদি একদিন আসতে পারেন তা হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো। কিন্তু আপনার সাধ মিটাবার আমার ক্ষমতা নেই। এই জন্য আমি খুব দুঃখিত। আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন এবং কিছু মনে করবেন না। আমি চেষ্টায় থাকবো যদি কোনও দিন সম্ভব হয় তা হলে নিশ্চয় আপনাকে ও মণিকে আনাবো।

লালনের গানের অনুবাদ বেশ ভাল এগোচ্ছে। কিন্তু অনেক কাজ বাকি আছে। আবার আমার বাংলাদেশ যেতে হবে আপনার সাহায্য নিতে। আমি আসছে ডিসেম্বর মাসে যেতে পারি। এই বছর না গেলে এর পরের বছর যাবোই। যাওয়া ঠিক হলে আপনাকে জানাবো।

কয়েকটা গান নিয়ে আমার বিশেষ প্রশ্ন আছে। এই গানগুলো আপনার সাথে এখনও আলোচনা হয় রি। চিঠিতে প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারলে ভাল হয়। আমি খুব উপকৃত হবো। কিন্তু যদি আপনার অসুবিধা হয় তা হলে এইবার থাক। সাক্ষাতে কথা হবে।

আমার প্রশ্নগুলো হচ্ছে এই : "আছে আল্লা আলে রসুল কলে" এই গানটায় অজান মানুষ কে? লালন বলেছেন যে তার রূপ "দুই রূপ মাঝার রূপ"। "দুই

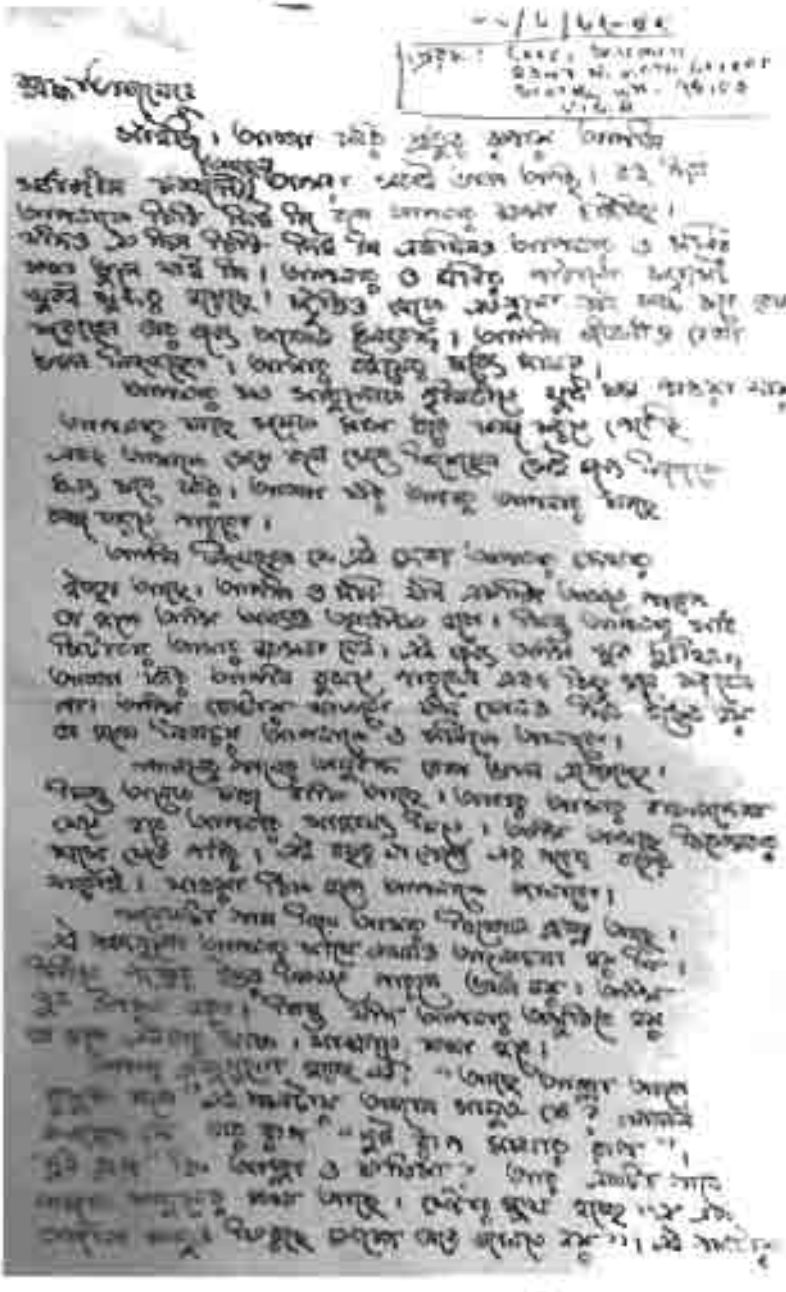

লালনশাহী সাধক খোদাবকশ শাহকে লেখা
ক্যারল স্যালোমন-এর একটি চিঠির প্রথমাংশ

রূপ" কি আল্লা ও ফাতিমা? আর একটা গানে অজান মানুষের কথা আছে। সেটার মুখ হচ্ছে "ঐ এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে তারে জানতে হয়"। এই গানটায় অজান মানুষ কে? আমি প্রথম ও দ্বিতীয় কলি লিখবো। কোনও ভুল থাকলে সংশোধন করবেন।

১) শরীয়তের বুনিয়াদে
জানে না তা শরীয়তে
জানা যাবে মারফতে
যদি মনের বিকার যায়॥

২) মূল ছাড়া সে আজগবি ফুল
ফুটেছে রে ভবনদীর কূল
চিরদিন এক রসিক বুলবুল
সেই ফুলেতে মধু খায়॥

লালন কি এই "অজান মানুষ" ফুলের সঙ্গে তুলনা করছে, না বুলবুলের সঙ্গে তুলনা করছে? আমার শেষ প্রশ্ন এই গান সম্বন্ধে : "আলিফ লাম মিম আহাদ নূরী"। লাম মানে ফাতিমা, কিন্তু "নুক্তা বুঝি হলো চরি" এর মানেটা কি? এই দুরূহ গানগুলো একটু বুঝিয়ে দিয়ে বাধিত করবেন।

আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রহণ করবেন। আমার ছোট বোন মণিকে আমার আন্তরিক ভালবাসা দেবেন। সময় পেলে তাকে আলাদা একটি চিঠি দেবো।

ইতি

ক্যারল

চিঠি : ৩

১৩/৯/৮৯

প্রেরক : Carol Salomon
2347 N. 60th Street
Seattle, Wa. 98103
U.S.A.

শ্রদ্ধাভাজনেষু

সাঁইজি। আশা করি প্রভুর কৃপায় আপনি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। আমরা ভাল আছি। এক বছর আগে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছি কিন্তু এখনও কোনও উত্তর পাইনি। হয়তো চিঠি পৌঁছায় নি এই ভেবে আবার একটা চিঠি লিখতে বসেছি। এবার আমি একজন ভদ্রমহিলার হাতে চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি আমাদের শহরে থাকেন। আধুনিক বাংলা কবিতা অনুবাদ করতে বাংলাদেশে যাচ্ছেন। তার হাতে একটু টাকাও গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আগামী বছর লালনের এক শততম মৃত্যুবার্ষিকী হবে। এই উপলক্ষে কোনও

বিশেষ অনুষ্ঠান হবে কিনা আমার জানবার আগ্রহ আছে। আমি সে সময় বাংলাদেশে যেতে পারি। তখন আশা করি আপনার সাহায্য আর একবার পাবো। আপনার সাহায্য যদি না পেতাম আমার বই সম্ভব হতো না। এই জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি আপনার কাছে সারা জীবন বাধিত থাকবো। এই বছরের মধ্যে বইটা শেষ করতে চেষ্টা করছি। অনুবাদগুলো কয়েকজন প্রকাশের কাছে পাঠিয়েছি। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।

আগের চিঠিতে কয়েকটা দুরূহ গানের সম্বন্ধে লিখেছি যেগুলো নিয়ে আমার বিশেষ প্রশ্ন আছে। আবার এই প্রশ্নগুলো লিখছি যদি আপনি চিঠিটা না পেলেন। উত্তর দিতে পারলে উপকৃত হবো।

আমার প্রশ্নগুলো হচ্ছে এই : "আছে আল্লা আলে রসুল কলে" এই গানটায় অজান মানুষ কে? লালন বলেছেন যে তার রূপ "দুই রূপ মাঝার রূপ"। দুই রূপ কি আল্লা ও ফাতিমা? আর একটা গানে অজান মানুষের কথা আছে। সেটার মুখ হচ্ছে "এ এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে তারে জানতে হয়"। এই গানটায় অজান মানুষ কে? আমি প্রথম ও দ্বিতীয় কলি লিখছি। কোনও ভুল থাকলে সংশোধন করবেন।

১) শরীয়তের বুনিয়াদে
জানে না তা শরীয়তে
জানা যাবে মারফতে
যদি মনের বিকার যায়॥

২) মূল ছাড়া সে আজগবি ফুল
ফুটেছে রে ভবনদীর কূল
চিরদিন এক রসিক বুলবুল
সেই ফুলেতে মধু খায়॥

লালন কি এই "অজান মানুষ" ফুলের সঙ্গে তুলনা করছেন, না বুলবুলের সঙ্গে তুলনা করছেন? "আলিফ লাম মিম আহাদ নূরী" এই গানটায় একটা বাক্য আছে "নুক্তা বুঝি হলো চরি"। এই বাক্যটার মানে কি?

আমার শেষ প্রশ্নগুলো "মীনরূপে সাঁই খেলে" এই গানটা নিয়ে। গানটা আপনার সঙ্গে আলোচনা হয় নি। পুরো গানটা লিখে দিলে ভাল হয়। "জুতেল" এবং "বর্শেল" এই দুটো শব্দের মানেটা কি? "সন্ধি"র মানেটা কি? "তিরধারা তিরসন্ধি খুলতে পারে সেই বন্দী" এই বাক্যটার মানে কি? তিরসন্ধি কি?

আপনি যে ক্যাসেটটা পাঠিয়ে দিয়েছেন সেটা আমার খুবই ভাল লাগে। সত্যি দারুণ হয়েছে। প্রায় ক্যাসেটটা শুনি। আর কি লিখবো? চিঠিটা অতিরিক্ত লম্ব হয়ে গিয়েছে। আর চিঠিটা বাড়াবো না।

আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি গ্রহণ করবেন। আমার ছোট বোন মণিকে আমার ভালবাসা দেবেন।

আপনার মেয়ে
ক্যারল

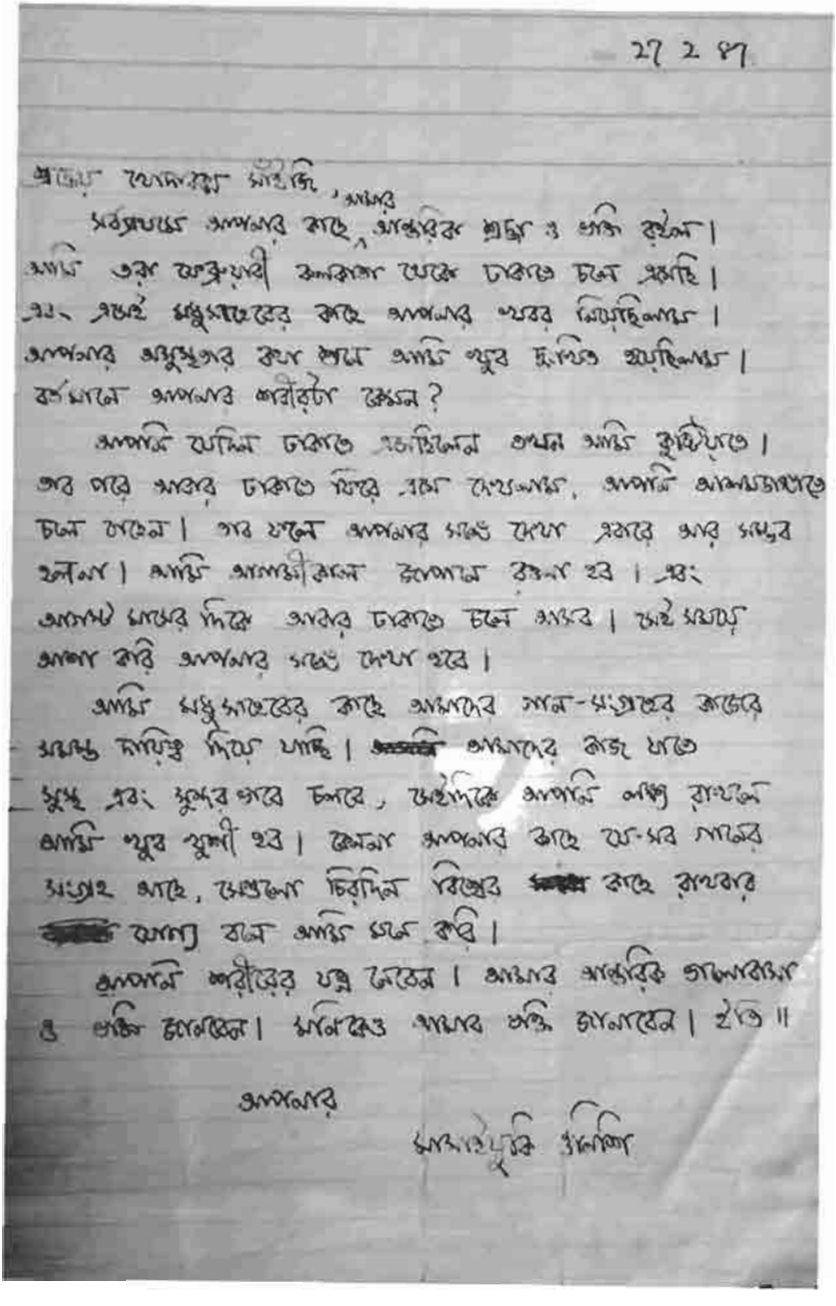

27 2 87

শ্রদ্ধেয় খোদাবক্স শাহজি,

সর্বপ্রথমে আপনার কাছে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি রইল। আমি ৩রা ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে ঢাকাতে চলে এসেছি। এবং এখানেই মধুসাহেবের কাছে আপনার খবর নিয়েছিলাম। আপনার অসুস্থতার কথা শুনে আমি খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। বর্তমানে আপনার শরীরটা কেমন?

আপনি যেদিন ঢাকাতে এসেছিলেন তখন আমি কুষ্টিয়াতে। তার পরে আবার ঢাকাতে ফিরে এসে দেখলাম, আপনি আলমডাঙাতে চলে গেছেন। তার ফলে আপনার সঙ্গে দেখা এবারে আর সম্ভব হলো না। আমি আগামীকাল ইমফালে রওনা হব। এবং আগামী মাসের দিকে আবার ঢাকাতে চলে আসব। সেই সময়ে আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

আমি মধুসাহেবের কাছে আমাদের গান-সংগ্রহের কাজের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাজ যাতে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে চলবে, সেইদিকে আপনি লক্ষ্য রাখলে আমি খুব খুশী হব। কেননা আপনার কাছে যে-সব গানের সংগ্রহ আছে, সেগুলো চিরদিন নিজের কাছে রাখবার অযোগ্য বলে আমি মনে করি।

আপনি শরীরের যত্ন নেবেন। আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও ভক্তি জানাচ্ছি। মাসিকেও আমার ভক্তি জানাবেন। ইতি॥

আপনার

মাসাইয়ুকি ওনিশি

খোদাবক্স শাহকে লেখা মাসাইয়ুকি ওনিশি-এর একটি চিঠি

বাংলাদেশের এক গ্রামীন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণে জাপানের বাউল গবেষক মাসাইয়ুকি ওনিশি

খোদাবক্শ শাহকে লেখা মাসাইয়ুকি ওনিশি-র চিঠি

চিঠি : ৪

২৭/২/৮৭

শ্রদ্ধেয় খোদাবক্স সাঁইজি

সর্বপ্রথমে আপনার কাছে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি রইল। আমি ৩রা ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে ঢাকাতে চলে এসেছি। এবং এসেই মধুসাহেবের কাছে আপনার খবর নিয়েছিলাম। আপনার অসুস্থতার কথা শুনে আমি খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। বর্তমানে আপনার শরীরটা কেমন?

আপনি যেদিন ঢাকাতে এসেছিলেন তখন আমি কুষ্টিয়াতে। তারপরে আবার ঢাকাতে ফিরে এসে দেখলাম, আপনি আলমডাঙ্গাতে চলে গেছেন। তার ফলে আপনার সঙ্গে দেখা এবারে আর সম্ভব হল না। আমি আগামীকাল জাপানে রওনা হব। এবং আগস্ট মাসের দিকে আবার ঢাকাতে চলে আসব। সেই সময়ে আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

আমি মধুসাহেবের কাছে গান-সংগ্রহের কাজের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাজ যাতে সুস্থ এবং সুন্দরভাবে চলবে, সেইদিকে আপনি লক্ষ্য রাখলে আমি খুশী হব। কেননা, আপনার কাছে যে-সব গানের সংগ্রহ আছে, সেগুলো চিরদিন বিশ্বের কাছে রাখবার যোগ্য বলে আমি মনে করি।

আপনি শরীরের যত্ন নেবেন। আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও ভক্তি জানবেন। মণিকেও আমার ভক্তি জানাবেন।

ইতি। আপনার-

মাসাইয়ুকি ওনিশি

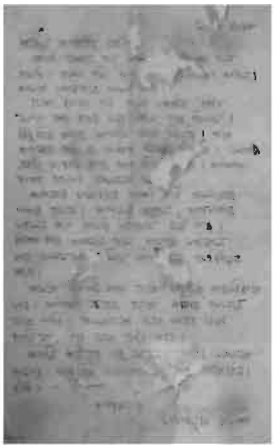

খোদাবক্স শাহকে লেখা মাসাইয়ুকি ওনিশি-এর একটি চিঠি

চিঠি : ৫

১৯.[...]. ১৯৮৮

শ্রদ্ধেয় খোদাবক্স সাঁইজি

প্রায়ই দুমাস হলে গেল [...] দেশে চলে এসেছি। আশা করি আপ[নারা সবাই ভালো আছেন। আমরা সপরিবারে ভালো আছি।

দেশে ফেরার পর বাউল সম্বন্ধীয় একটা লেখা শেষ করার জন্য ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। কিছু দিন আগে লেখাটা সেরে নিয়েছি। তাতে আপনার ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী [দিয়েছি।] (লেখাটা একটা সংস্থার কাছে জমা দিতে [... ।] আপাততঃ ছাপা হওয়ার সম্ভাবনা [...])

আপনার মহোৎসব আশা করি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আপনার আশ্রম, আপনাদের সকলের কথা আমার সবসময়ে মনে পড়ে। বিশেষ করে আপনার ছেলে আমাকে সাইকেলে করে আলমডাঙ্গা নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই দিনের কথা।

আমরা আগস্ট মাস থেকে কিছুদিন আমেরিকাতে যাব। আগামী বছরেও হয়তো আবার সেখানে যেতে পারি। বাংলাদেশে যেতে পারব কিনা জানি না, তবে যেতে চেষ্টা করব।

আপনি শরীরের যত্ন নেবেন। বাড়ীর সকলকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও ভক্তি জানাবেন। ইতি॥

আপনাদের

মাসাইয়ুকি ওনিশি

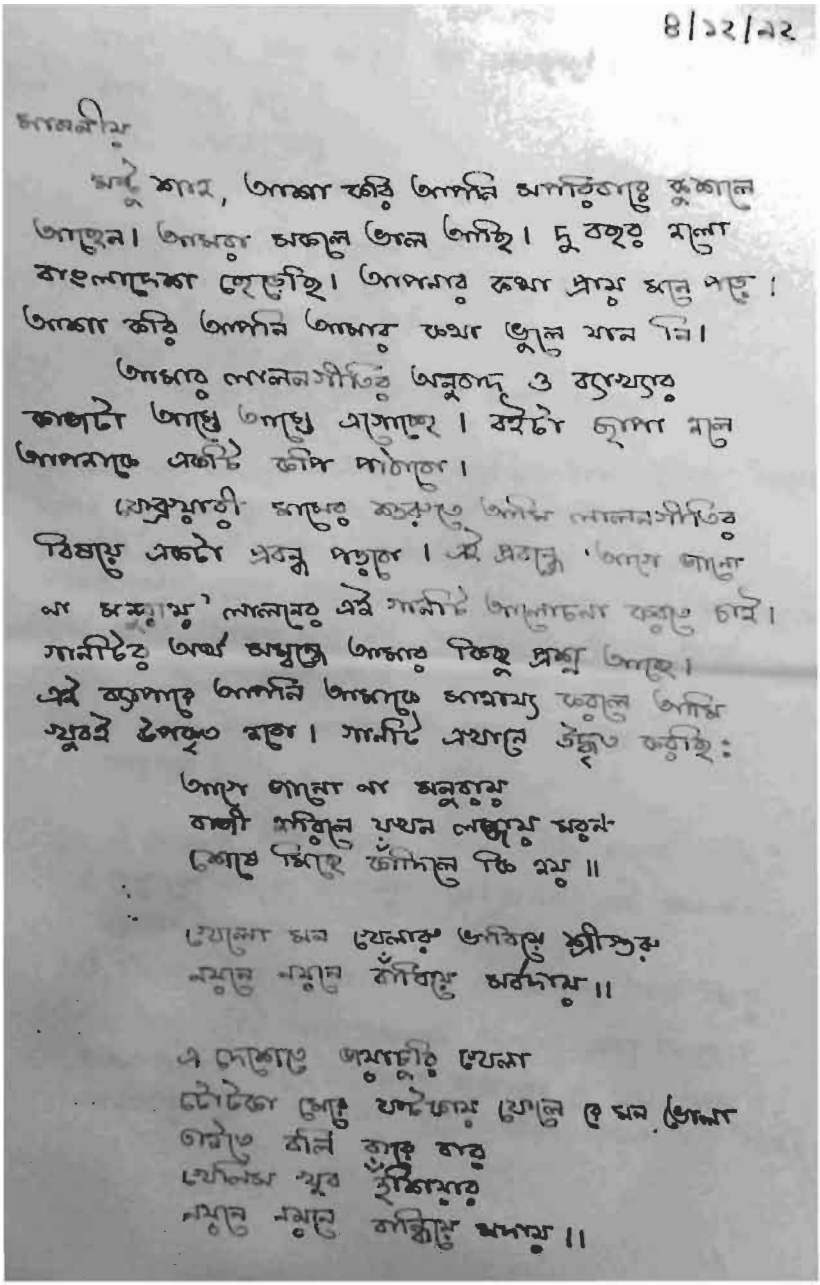

৪/১২/৯২

বরণীয়

মন্টু শাহ, আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমরা সকলে ভাল আছি। দু বছর হলো বাংলাদেশ ছেড়েছি। আপনার কথা প্রায় মনে পড়ে। আশা করি আপনি আমার কথা ভুলে যান নি।

আমার লালনগীতির অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। বইটা ছাপা হলে আপনাকে একটি কপি পাঠাবো।

ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতে আমি লালনগীতির বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পড়বো। এই প্রবন্ধে 'আর জানো না মনুরায়' লালনের এই গানটি আলোচনা করতে চাই। গানটির অর্থ সম্বন্ধে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। এই ব্যপারে আপনি আমাকে সাহায্য করলে আমি খুবই উপকৃত হবো। গানটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

আর জানো না মনুরায়
বাজী হারিলে যখন লজ্জায় মরন
শেষে গিয়ে কাঁদিলে কি হয় ॥

খেলো মন খেলার ভাবিয়ে শ্রীগুরু
নয়নে নয়নে রাখিয়ে সর্বদায় ॥

এ দেশেতে জুয়াচুরি খেলা
চৌটক্কা চোর খটকায় খেলে রে মন ভোলা
তাইতে লাল কাক বাজ
খেলিছে খুব হুঁশিয়ার
নয়নে নয়নে রাখিয়ে সদায় ॥

লালনপন্থী সাধক আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহকে লেখা ক্যারল সলোমন-এর একটি চিঠির হস্তাক্ষর

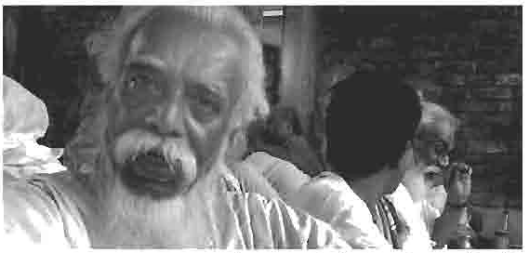

সাধুসঙ্গে আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ

মন্টু শাহকে লেখা ক্যারল সলোমনের চিঠি

চিঠি : ৬

৪/১২/৯২

মাননীয়

মন্টু শাহ, আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমরা সকলে ভাল আছি। দু বছর হলো বাংলাদেশ ছেড়েছি। আপনার কথা প্রায় মনে পড়ে। আশা করি আপনি আমার কথা ভুলে যান নি।

আমার লালনগীতির অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। বইটা ছাপা হলে আপনাকে একটি কপি পাঠাবো।

ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতে আমি লালনগীতির বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পড়বো। এই প্রবন্ধে 'আগে জানো না মনুরায়' লালনের এই গানটি আলোচনা করতে চাই। গানটির ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করলে আমি খুবই উপকৃত হবো। গানটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

আগে জানো না মনুরায়
বাজী হারিলে যখন লজ্জায় মরণ
শেষে মিছে কাঁদিলে কি হয়॥

খেলো মন খেলারু ভাবিয়ে শ্রীগুরু
নয়নে নয়নে বাঁধিয়ে সর্বদায়॥

এদেশেতে জুয়াচুরি খেলা
টোটকা মেরে ফটকায় ফেলে রে মন ভোলা
তাইতে বলি বারে বার
খেলিস খুব হুঁশিয়ার
নয়নে নয়নে বান্ধিয়ে সদায়॥

চোরের সাথে নাহি খাটে ধর্মদাড়া
হাতের অস্ত্র কভু করিস নে হাতছাড়া।
রাগ অস্ত্র ধরে দুষ্ট দমন করে
স্বদেশেতে গমন করো রে ত্বরায়॥

চোয়ানি বান্ধিয়ে খেলে যেই জনা
কাহারো যে সাধ্য সেই অঙ্গে দেয় হানা।

ফকির লালন বলে আমি
তিন তেরো না জানি
বাজী সেরে যাওয়া ভার হলো আমায়॥

খোদা বক্স আমাকে গানটির আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে 'বাজি'র অর্থ হচ্ছে বীজ এবং 'চোয়ানি'র অর্থ হচ্ছে বীর্যপাতপূর্ব-ক্ষরণ। গানটিতে বীর্যধারণের গুরুত্ব রূপকেভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এ আধ্যাত্মিক অর্থ ছাড়া আমার মনে হয় গানটিরে বাহ্যিক অর্থ আছে। এই বাহ্যিক অর্থ নিয়ে আমার প্রশ্ন :

১) বাহ্যিক জগতে লালন কি খেলা বর্ণনা করেছেন?

২) এই খেলার পরিপ্রেক্ষিতে 'চোয়ানি'র মানেটা কি? (পুরোনো গানের খাতায় 'চৌআনি' এই বানানও লেখা আছে।)

৩) 'তিন তেরো না জানি' এই বাগধারার অর্থ কি?

আর দুটি গান সম্পর্কে আমার প্রশ্ন আছে। প্রথম গানটি হচ্ছে : 'কারে শুধাকো রে মর্ম কথা'। গানটির মুখ ও প্রথম দুটো কলি উদ্ধৃত করে দিই :

কারে শুধাবো রে মর্মকথা কে বলবে আমায়
যারে শুধাই সে বলে না মর্ম কোথা পাই॥

যে দিনে সাঁই নিরাকারে
ভেসেছিলেন ডিম্ব ভরে
কি রূপ থেকে তার মাঝারে
কি রূপে গণ্য হয়॥

সেতার রূপ ছিল যখন
গহণা রূপ তার পাকপাঞ্জাতন
আকার কি নিরাকার তখন সেহি দয়াময়॥

আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই : গানটির পরিপ্রেক্ষিতে কে 'সেতার রূপ' ধারণ করেছেন? দ্বিতীয় গানটি হচ্ছে : 'আকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা'। গানটির মুখ ও প্রথম কলি উদ্ধৃত করে দিই :

আকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা
আহামদ আর আহাদ নামের বিচার হলে যায় জানা॥
খুদিতে বান্দার দেহে খোদা সে লুকাইয়ে
আহাদে মিম বসায়ে আহামদ হলে সে না॥

'খুদিতে' এই শব্দটির অর্থ নিয়ে আমার প্রশ্ন। অনেক বাউল গানে 'খুদি' ও 'বেখুদি' শব্দ আছে। যেমন দুদ্দু শাহের এই গানে :

খোদ রূপেতে আছে গো সদাই
খুদি ছেড়ে বেখুদি হলে
আল্লাকে সে দেখতে পায়॥

লালন ও দুদ্দু শাহ 'খুদি' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন? এই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠালে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হবো।

আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানবেন। চৌধুরী সাহেবকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। আপনার জবাবের আশায় রইলাম।

ইতি– ক্যারল সলোমন

বিজয় সরকার ও তাঁর পুত্র-পুত্রবধূর সাথে ক্যারল সলোমন (সর্ব বামে)

বিজয় সরকারকে লেখা ক্যারল সলোমনের চিঠি

চিঠি : ৭

মাননীয়েষু

আমি একজন আমেরিকান গবেষক। লোকগীতি বিশেষ করে বাউল গান নিয়ে গবেষণা করি। আপনার গান "তুমি জানো না রে প্রিয়" ইত্যাদি বাউলদের মুখে শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার মনে হয় আধুনিক পদকর্তার মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ।

আপনার সাথে দেখা করবার আমার খুব ইচ্ছা আছে। আপনি এবং আপনার গান সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ লিখতে চাই। দু মাস আগে আমি ঢাকায় এবং কুষ্টিয়ায় ছিলাম। দুঃখের কথা তখন আপনার সাথে আলাপ করতে পারি নি। কিন্তু জনাব খন্দকার রিয়াজুল হকের কাছে আপনার ঠিকানা পেয়েছি। শুনলাম আপনি মাঝে মাঝে কলকাতায় যান। গেলে দয়া করে আমায় চিঠি দিয়ে জানাবেন।

আষাঢ় মাসের গোড়ার দিকে আমি যশোরে যেতে পারি। আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে আপনার বাসায় যাবো। সেই সময়ে কোন দিনে বাসায় থাকবেন এবং যশোর টাউন থেকে আপনার গ্রামে কি ভাবে যেতে হবে চিঠি দিয়ে জানালে আমি খুব উপকৃত হবো।

আপনি আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানবেন। আপনার চিঠির আশায় থাকলাম।

ইতি– কেরল সালোমন
C/O Roma Chakraborty
Patraput, Pearson Palli
Santiniketan, Birbhum, West Bengal, India

Notes on Contributors

Clinton B. Seely, Professor Emeritus of South Asian Languages and Civilizations at The University of Chicago. He obtained his Ph.D. degree in 1975 from the University of Chicago with his thesis entitled *Doe in Heat: A Critical Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das (1899-1954) with Relevant Literary History from the Mid-1920's to the Mid-1950's.* His professional life began with his appointment as a Peace Corps Volunteer to East Pakistan (present-day Bangladesh) from 1963 to 1965 and ended, so to speak, as a professor in the University of Chicago's Bangla Department from 1975 onwarduntil his retirement. He has received worldwide acclaim for his compilation of a textbook for Bangla language education, and has obtained mastery in the Bangla language, research of literary works, and translation. His published works include *Rain through the Night* (1973) (revised by the author)*: Translation of a novel by Buddhadeva Bose*; *A Poet Apart: A Literary Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das (1899-1954)* (1990); *Intermediate Bangla* (2002); *The Slaying of Meghanada: A Ramayana from Colonial Bengal* (2004).

Śhaktināth Jhā, Professor and researcher. He received his Honours in 1960 from Anandacandra College in the Jalpaiguḍi district of West Bengal in India, his Masters from Kolkata University in 1962 and earned his Ph.D. from Kolkata University in 1983. Recently for his research efforts he was awarded the prestigious Doctor of Letters (D.Litt.) degree from the University of Kolkata. For his professional life he taught as a professor at Kṛṣṇāth College in Baharampur in the district of Murśidābād from 1965 to 2001. He is renowned for his research and has a wealth of insightful knowledge. He has been dwelling and conducting his research for almost twenty years on the banks of the Ganges in Baharampurat Rādhā Ghāt. The *bhāba* (from Skt. *bhāva*) or "devotional soul" of the *sādhaka* or "aspirant" and the wider devotional sphere is Śhaktināth Jhā's delightand forms the wider universe of his analytical research. He has written several compositions on Bangla's celebrated folk *bhāba-sādhaka* Fakir Lalan Sain, specifically on his lyrical phrases, observations, thoughts on society, and other subjects. Many of these writings have been turned into books, of which relevant mention are *Fakir Lālan Sain: Deśa-Kāla o śilpa, Bastubādi Baul;* also edited the compilations *Lālaner Gan, Baul-Fakir Padabāli* and other books. Ever engaged in ceaseless research to unveil the principles of the *sādhanā* system as practiced by Baul fakirs, his published books and Bangla articles as found in the collections of research scholarsare held with the highest esteem and respect, so much so that his Bangla compilations have become the topic of discussion by researchers in the United States, Japan and other countries.

Thibaut d'Hubert's research interest focuses on premodern Bengali literature. He studied Bengali and Persian at the Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) from where he obtained his M.A. He was also trained in Sanskrit at the department of Indian Studies, Paris 3 Sorbonne Nouvelle. He completed a Ph.D. at the fourth section (Historical and Philological Sciences) of the École Pratique des Hautes Études (EPHE) in Paris in 2010 and then joined the department of South Asian Languages and Civilizations (SALC) at the University of Chicago. The subject of his current book project is the contextualized analysis of the complex poetics of the works of Ālāol (fl. 1651-1671), a prolific Bengali poet and translator who lived in what is today's Myanmar. The monograph also discusses the formation of vernacular Muslim literary traditions around the Bay of Bengal in the early modern period. His next project is titled: "The Celtic Fringe and Early Orientalism in Bengal, c. 1770–1790: Editing and analyzing the Indo-Persian texts of the Staatsbibliothek's John Murray Collection". It explores the paths linking textual practices and scholarly traditions from Burma to Scotland on the eve of colonialism. Thibaut d'Hubert is also associate researcher of the UMR 7528 Mondes iranien et indien (Paris) and a fellow of the Zukunftsphilologie program (Berlin) for the Academic year 2013-14.

Hanne-Ruth Thompson is one of the world's leading specialists in Bangla linguistics and language pedagogy. She did her PhD at SOAS in London where she also taught Bengali for many years. She is the author of *Bengali: A Comprehensive Grammar* (Routledge, Oxford, 2010), two *Bengali* dictionaries published by Hippocrene (2010) and Bengali for the London Oriental and African Language Library (John Benjamin, Amsterdam, 2012). With these two books Dr Thompson offers an exciting, modern and consistent approach to Bangla language structures. Her work is equally important for learners of Bengali as a foreign language and for linguists and researchers dealing with the Bangla language. She currently lives in Sierra Leone, West Africa, with her husband, who works in support of the Sierra Leonean government tackling poverty and promoting economic development. She has taken this opportunity to apply her linguistic skills to Krio, but also continues with her research on Bangla.

Dong Yu Chen, is one of several translators of Rabindranath's compositions and the primary editor. He is also a biographer of Rabindranath in the Chinese language, having spent much of his life immersed in research on Rabindranath's life, compositions and compilations, and alongside his translations Professor Dang Yu Chen was recognized for his dedication by being awarded an honorary Doctor of Literature degree from India's Rabīndra-Bhāratī University. Apart from this, the government of West Bengal in India through the Bangla Academy bestowed upon him the

Rabindranath Prize. Alongside his research on Rabindranath and translations of Rabindranath's literary works into Chinese, Professor Dang Yu Chen has translated the works of other highly esteemed authors into Chinese from the original Bangla: Bankimcandra Chattopadhay's novels *Indirā*, *Kṛṣṇakānter Uil*, *Rājasima* and *Candraśekha*, and Tarkanath Gangopadhya's novel *Svarṃalatā*. He also published in Chinese "The History of Eastern Literature," the title of a textbook with various authors. Further, Professor Dang Yu Chen was a contributing author to "Modern Indian Literary History" which includes "Bangla Literary History." Regarding Professor Dang Yu Chen's education and professional life, from 1960 to 1965 he studied in the Soviet Union at Leningrad (modern-day St. Petersburg) University in its department of Eastern Studies where he received the highest instruction in the Bangla language and its literature. In his professional life, from 1965 onward he taught in the Russian language in literature and history departments of the Chinese Communist Party's best school. In 1992 he was appointed as a professor, and in 1993 was honored by the assembly of ministers for his contributions. In 1997 he retired from the Party School. From 2000 to 2007 he was invited for eight years to Shen-Jhen University to teach Chinese to students from abroad. Since 2008 he has been teaching students from abroad and continuing his Bangla research in Beijing, one of the major university research centers in South Asia.

Keith E. Cantú, first arrived in Bangladesh three years ago on a Fulbright teaching fellowship, which he received along with intensive training in the Bangla language following the completion of his undergraduate studies at Pepperdine University near Los Angeles, California. For his professional life, he had originally aimed to be a diplomat and successfully completed several internships both with the International Labour Organization and the U.S. Department of State, but his transformative experiences with the Lalan *fakir* and *sādhaka* communities in Bangladesh inspired him to switch gears and engage in a comprehensive study of religion instead. To this end he has received an MA in Comparative Religion from the University of Washington in Seattle, where he is now completing a second MA in South Asian studies while applying for Ph.D. programs relating to this field of religious studies. The primary subject of his comparative analysis is shared letter symbolism between the Arabic, Sanskrit and Hebrew alphabets, being particularly interested in comparing the way the Bangla bh b-s dhaka Lalan Sain (d.1899) and famous European and North American ceremonial magicians such as Aleister Crowley (1875-1947) have harnessed lyrical speech to embed an intricate network of esoteric symbols into individual letter units. Keith is an avid singer of Lalan using the one-stringed ektara *(gopijantra)* and *ḍugi* (drum), and continues to be awestruck by the spirit of humanistic *bhakti* or devotional love that pervades every line of Lalan's revelatory songs.

Nazmin Maturza, is a rising prolific literary author and cultural analyst from Bangladesh. She is versed in the art of creative writing such as poetry and fiction novels, and her investigations into the field of religious studies form the foundation of her research. Published research and writings include: *Bangladesher Oitijjobahi Baddojantro, Bāṃlā Sāhityer Alikhita Itihāsa*, and *Folklore o Likhita Sāhitya: Jārigāner Āsare 'Biṣād-Sindhu' Āttīkaraṇa o Paribeśan-Paddhati* (collaborative work). Beyond these, she has written an introduction for the compilation *Bāṃlā Puthi Sāhitya*, and she was compiled some valuable articles written by Abdul Karim Shahitya Bisharad, Dr. Muhammad Shahidullah, Muhammad Enimul Haque and other scholars. Among her creative works a few deserve special mention, including her books on poetry: *Guruparamparā* (2010), *Śrīrādhār Ukti* (2011), *Mahāmāyā Kaṅkābatī* (2013); and her novel *Nonājaler Corābāli* (2008). The Bangla Academy, Dhaka, published her writings in February 2012, title : *Folklore o Likhita Sāhitya: Jārigāner Āsare 'Biṣād-Sindhu' Āttīkaraṇa o Paribeśan-Paddhati* a book that received high acclaim for its composition, and it's City-Anondo Alo literature prize 2012. In 2011, collaborating with the University of Dhaka and the Bangla Academy, she presented an article in 2nd international congress of Bengal Studies on December 2012 and 2013, where the Bangladesh Folk Art and Crafts Foundation arranged a seminar with open dialogue and speeches regarding her articles. She is currently the executive director of the Bhabnagar Foundation.

Carol Salomon, American researchers, obtained PhD on *Kalika-Mangala*, she conducted many research on Both Bangla. She written informative book 'Dui Bangla'. She spent long time for translatng lalon songs in Bangladesh. Professor Carol Salomon, who died in 2009, was a folk researcher and a teacher at the Department of Asian Languages and Literature and South Asian Studies Program, Washington University. She first arrived in Bangladesh in 1974 and worked on Fakir Lalon Shai for over two decades. Professor Salomon collected rare songs and manuscripts during her stay in Bangladesh.

Masayuki Onishi was bron and brought up in Japan. He obtained a BA in modern British literature at the University of Tokoy, and then spent several years in India, teaching Japanese and studying Bengali language, literature and music, as well as carrying out fieldwork on the folk culture of Bengal in both Bangladesh and India. He is experienced in teaching language in Silent Way. At present he is at the Department of linguistics, Australian National University, Canberra, writing his PhD Thesis on the grammar of Motuna, a non-Austronesian language spoken in southern Bougainville, Papua New Guinea.

Instructions for Contributors

BHABNAGAR : INTERNATIONAL JOURNAL OF BENGAL STUDIES

Bhabnagar international journal of Bengal Studies (BIJBS), peer-reviewed academic journal published twice a year by the Bhabnagar Foundation of Bangladesh. It features scholarly articles representing theoretical perspectives and research in Bangla or Bengal Studies and related fields, as well as book, audio recording, film, video, and multimedia reviews.

MANUSCRIPT SUBMISSION

Articles submitted for publication should be e-mailed as Microsoft Word file attachments to: saymonzakaria@gmail.com

The Editors
Bhabnagar : International Journal of Bengal Studies
Bhabnagar foundation, Concord Emporium, 45 Basement
253-254, Elephant Road, Katabon, Dhaka-1205, Bangladesh

At the time of submission, the author will be required to declare that the paper is unpublished and is not being considered for publication elsewhere. Prior to publication of a paper, the author will be asked to assign copyright to Ektara, a publication winks of Bhabnagar Foundation.

Contributors are responsible for obtaining permission to reproduce any materials, including photographs and illustrations, for which they do not hold copyright, and for ensuring that the appropriate acknowledgements are included in the manuscript. Contributors may consult the editors on how to go about doing this.

All articles in the journal are peer-reviewed by two anonymous assessors.

BIJBS is what is known as a Open Access online journal, meaning that although the journal itself is available via subscription, individual articles can be published under an Open Access model. Authors who would like to publish their article via Open Access should fill out the Open Access Copyright Transfer Form posted on the Bhabnagar : IJBS website. For further information about Open Access at Bhabnagar Foundation, please visit:

http://vabnagarfoundation.com/journal

MANUSCRIPT PREPARATION

Articles must be in Bangla and in principle between 9,000 and 12,000 words in length, including footnotes, to be submitted by e-mail attachment as a Word file. The title of the manuscript, author's name, institutional affiliation, address, email address, an abstract of up to 200 words in English, and a list of approximately five to eight key words should appear at the top of the file. Submissions, or enquiries about prospective

submissions, may be sent to the Editor of the Bhabnagar.

All submissions should be made in Bangla, although exceptions may be made in certain circumstances after consultation with the editors. Any non-Bangla manuscript must be translated into Bangla before final acceptance.

Submitted articles are sent out to at least two anonymous reviewers for evaluation. Bhabnagar : IJBS editors will delete the author's name from the head of the file, but authors should ensure that they cannot be identified in other ways – for example, in the Microsoft word "File Properties", or citations of the author's own work.

The article title should be given in capitals at the top of the file, with the author's name, institutional affiliation, and e-mail address in lower case beneath.

The abstract (maximum 200 words in English) should be included before the main text, in italics, single spaced; please do not put this in a separate file. Bear in mind that the abstract will be freely available for viewing online, and that readers will often decide whether or not to download the article on the basis of what they see in the abstract. The abstract should reflect the article contents as clearly and concisely as possible.

If you use characters with diacritics (e.g. Vietnamese, or transcriptions from Arabic, Farsi, Sanskrit or other languages) please provide a PDF version of the file so that we can check that all fonts are displaying correctly.

Headings within the article should be unnumbered, with the first level of headings in capitals, second level in bold lower case (with the first letter of the first word and important words capitalized), and the third level in lower case italics (first letter of the first word capitalized). Format headings individually, rather than applying Word styles.

For quotations, double quotation marks should normally be used, with single quotation marks for quotations within quotations, though single quotes may also be used for glosses and definitions if desired (e.g. 'Way'). Quotations of more than 50 words should be broken off from the text without quotation marks, one blank line inserted above and below, left-indented 1 cm.

Footnotes should be inserted using the Word footnote (not endnote) function, consecutively numbered from beginning to end. Any acknowledgements should be placed in a separate paragraph after the end of the main text, before the list of references, marked "Acknowledgements"; this will be typeset as an unnumbered footnote at the bottom of the first page.

All tables, graphs, figures and illustrations should be submitted as

separate, clearly identified files. A descriptive heading, with a citation of the source and text placement advice, should be inserted inside the main text of the article after the paragraph in which the item is first referred to; the item will normally be typeset at the top of the next page. If at all possible, create tables and graphs in Excel, so that they can be edited and reformatted before typesetting. Illustrations submitted as graphics files must be at a resolution of 300 dpi or more.

MANUSCRIPT PROCESSING

1. A manuscript is read first by the editor, who determines if it is of sufficient interest to proceed further. If not, the editor notifies the author that this is the case. If the manuscript is of sufficient interest, it is sent to outside referees who send written evaluations and recommendations, sometimes with suggestions for revision, to the editor. The editor may reject the manuscript, delay a decision while encouraging revisions, or accept it substantially as is. Ordinarily, the editor will forward the referees evaluations (anonymously) along with their decisions. Authors of articles may suggest names of appropriate (and inappropriate) referees.
2. The review process is intended to be a "double blind" peer-review. Authors have the responsibility for removing information that might reveal their identity to reviewers, and may choose to omit or abbreviate acknowledgements or notes that contain personal information such as the names of advisors, institutions, or spouses/partners. (If the article is accepted for publication, this information can be reinserted.) Requests by authors or reviewers to have their names revealed to the other party will, of course, be honored.
3. The review process is generally completed within four months. Authors will be notified if there is a delay.
4. Articles and reviews are accepted for publication subject to editing for style. Authors of articles will have an opportunity to make final changes after copyediting, and to correct printer's errors in page proofs.
5. Authors of articles will receive three copies of the journal free of charge; authors of reviews will receive one copy. Authors will also receive a PDF file of their article or review.

PLANNING OF BHABNAGAR

Bhabnagar's main mission is to evaluate and reconcile all kinds of effort and research work on Bengal Studies, as carried out by different scholars and researchers in different languages around the world.

For more than a hundred years, different studies on Bengali topics have been accomplished in many different countries in Europe, the Americas and Asia. But all of this research work has never been reconciled together. Thus a global knowledge network of Bengal Studies may usher in a new era. Through this initiative, researchers will be able to add new dimensions to their work in Bengal Studies.

In the planning of Bengal Studies for International Knowledge Network, Bhabnagar is paying deep respect to the famous U.S. scholars Edward C Dimock, Edward C Dimock Jr., Charles Capwell, Clinton B. Seely, Tony K. Stewart, Mary Frances Dunhan, Sally Grossman, Carol Salomon; Joseph O'Connell, Kathleen O'Connell of Canada; William Radice and Jeanne Openshaw of the UK, William Smith of Sweden, France Bhattacharya, Khoshe Pass and Philippe Benoit of France; Dusan Zbavitel of the Czech Republic; Hanna R. Thompson and Hans Harder of Germany; Dong Yu Chen of China; Tsuyoshi Nara and Masayuki Onishi of Japan and so forth for their love for Bengali, and their tremendous works on Bengali linguistics, literature and culture.

Bhabnagar's primary mission is to evaluate and reconcile all kinds of efforts and research work on Bengal Studies done by different scholars and researchers of different languages around the world.

আলোকচিত্রে ভাবনগর ফাউন্ডেশন-এর কিছু কার্যক্রম

ভাবনগর আয়োজিত সিম্পোজিয়াম অন এথনোমিউজিকোলজি অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ, ২০ ডিসেম্বর ২০১৩
প্যানেল বক্তা আলীম আল রাজী, ড. ইউরি বল্লামুণি এবং ড. মঞ্জুলিকা রহমান

চাকার নৃত্যে মৎস্যজীবী প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখছেন মঞ্জুলিকা রহমান

আসামের বিহু গীতি-নৃত্য বিষয়ে বক্তৃতারত রিহান্না খেসদি

সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারী দেশি-বিদেশি সংগীত-নৃত্য ও সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞদের একাংশ

ভাবনগরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ভিয়ান আয়োজিত পোশাকে চিত্র-গানের ঐতিহ্য শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন স্থপতি রফিক আজম; উপস্থিত রয়েছেন চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, স্থাপতি নিজামউদ্দিন আহমেদ এবং অলিয়স ফ্রসেজের পরিচালক

ভাবনগরের ওয়েবসাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন সাধকশিল্পী আরজ আলী বয়াতী ও অন্তর সরকার

ভাবনগর ও ভিয়ানের অনুষ্ঠানে সাধক-শিল্পী সাইদুর রহমান বয়াতী পুথি পাঠ করছেন কাব্য কামরুল

পোশাকে পটচিত্র-গানের ঐতিহ্য শীর্ষক প্রদর্শনীতে নড়াইলের পাটগানের শিল্পীরা, ৩ মে ২০১৩

ভাবনগর ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনায় ইউনেস্কো আয়োজিত ইন্টানজিবল কালচারাল হেরিটেজ বিষয়ক ওয়ার্কশপের জন্য ফিল্ডওয়ার্ক, ১৯ জুলাই ২০১৩; মানিকগঞ্জের জান্না গ্রামে বুড়াবুড়ির সঙ পরিবেশনার দুটি দৃশ্য

ফিল্ডওয়ার্কে ইউনেস্কোর প্রশিক্ষক ও ঐতিহ্য-বিশেষজ্ঞ যুক্তরাজ্যের ড. হেরিয়েট ডেকন পাটিতে বসে সুগভীর মগ্নতায় বাংলাদেশের ইন্টানজিবল কালচারাল হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত পরিবেশনা শিল্পকলা পর্যবেক্ষণ করছেন

BHABNAGAR

International Journal of Bengal Studies

ISSN 2313 6065